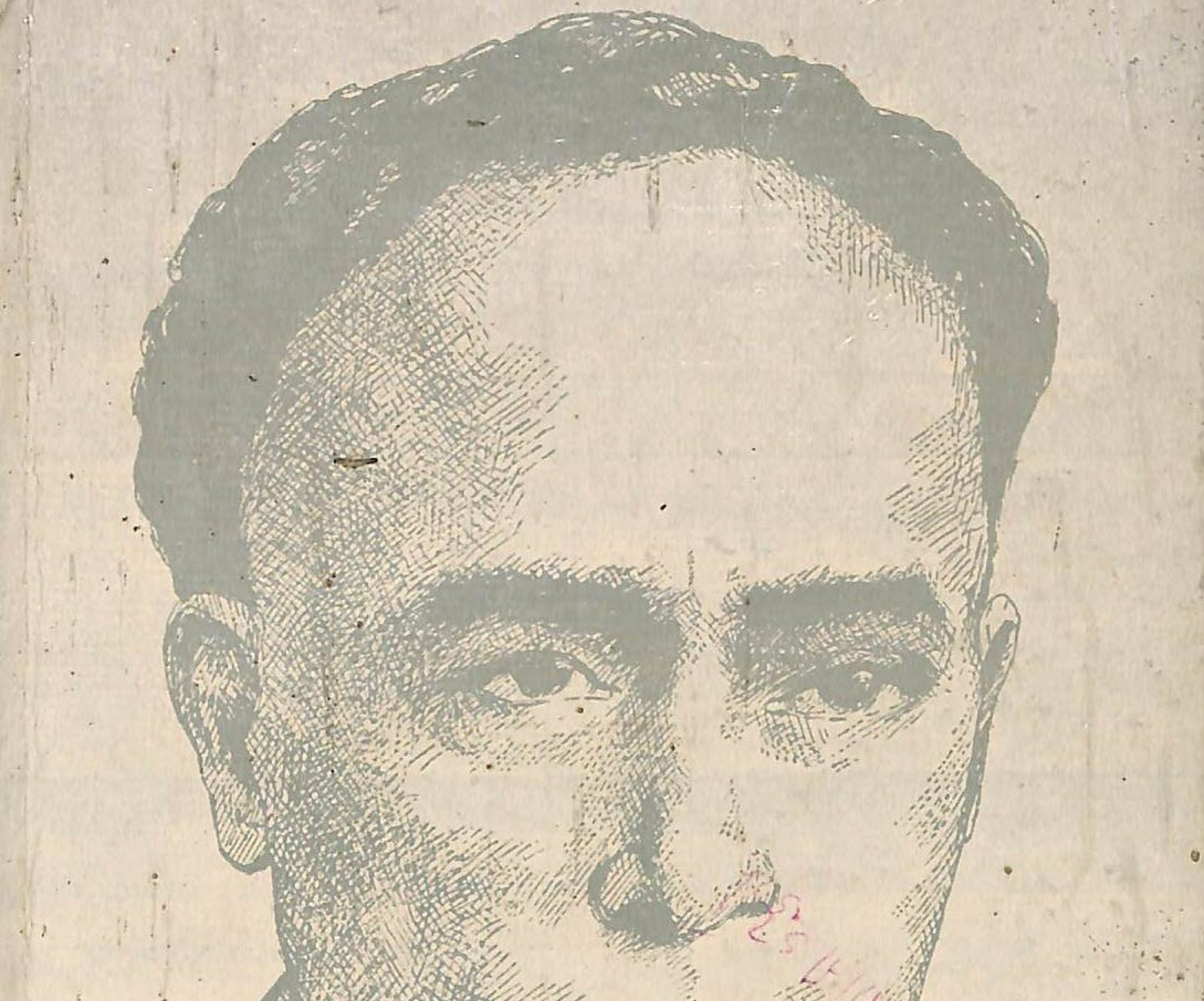


ভারতের নারী মুক্তি আন্দোলন

ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলন

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেন্টার

বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টার
৮১, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা-২৯—এর পক্ষে
পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ ৫ই পৌষ ১৩৯৪
গ্রন্থমেলা ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ শিল্পী—
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক—
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মুদ্রণ—
ভবানীপুর আর্ট প্রেস,
৮০, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০২৫

মূল্য—১৫৲

সাহিত্য সাধক

শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী

প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে বিদ্যাসাগর বক্তৃতা মলা'য় ভাষণ করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর নামের সহিত তা সংযুক্ত বলে আমি বাংলার নারী উন্নয়ন আন্দোলনকে বিষয় করে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে পাঁচটি ভাষণ দিয়েছিলাম। সেগুলি 'উদ্বোধনের' কার্ত্তিক ১৩৮২ হতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলি নিয়ে একটি পুস্তক আকারে প্রকাশের কোনও চেষ্টা এতদিন হয় নি।

সম্প্রতি বিদ্যালয় রিসার্চ সেণ্টারের কর্তৃপক্ষ সেই ভাষণগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশ করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাই এগুলি পুস্তকের বিন্যাসে সজ্জিত করা হয়েছে। আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার করার জন্য একটি নূতন অধ্যায়ে পুস্তকের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। সমগ্র আলোচনার প্রকৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য তার নাম দেওয়া হল ভারতের নারীমুক্তি আন্দোলন। এই ভাবে পুস্তকখানির আবির্ভাব ঘটার কৃতিত্ব 'বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টারের' সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারীর। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা বৈশাখ ১৩৯২

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

(১)

স্বাধীনতালাভের পর অতি সম্প্রতি আমাদের সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সংবিধান নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও অধিকারগত ভেদ স্বীকার করে না। উভয়েই পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, উভয়েরই এককালীন একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। উভয়েই যে কোনও সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত হবার অধিকার রাখে। অতি সম্প্রতি আমাদের দেশের রাষ্ট্রের নেতৃপদে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি একজন মহিলা। আই, এ, এস, চাকুরীতে মহিলারা সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করে নানা প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত হন। শিক্ষায় অসামান্য অধিকার লাভ করে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন।

স্বাধীনতার পূর্বে কিন্তু এ অবস্থা ছিল না। অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে সমাজে নারীজাতির উন্নয়নের জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়েছিল এবং কিছু সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। সে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে। তার আগে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় হিন্দুনারীর অবস্থা দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল।

অতি প্রাচীনকালে কিন্তু অবস্থা এমন ছিল না। ঠিক বলতে কি বৈদিক যুগে ভারতীয় নারীর অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। একরকম বলা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও অধিকারগত ভেদ ছিল না। পরে দেখি, স্মৃতির যুগে নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক অধিকারে বৈষম্য অনুপ্রবেশ করেছে। আরও পরবর্তী কালে দেখি নারীর অবস্থা আরও অধঃপতিত হয়েছে। নারী এই অবস্থায় অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ, পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। পুরুষের বহুবিবাহে অধিকার স্বীকৃত, নারীর নয়। বিধবা হলে নারী

নিতান্তই দাসীর অবস্থায় অবনমিত হয়। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর চিতায় আরোহণ করে তাকে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হয়। শিক্ষা হতে সে একরকম বঞ্চিত। কারণ গৌরীদান প্রথা প্রচলিত হওয়ায় বাল্যকালেই তার বিবাহ হয়ে যায় এবং তার পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়হীন পুরুষসমাজে আদৌ অনুভূত হত না।

স্থতরাং ভারতীয় হিন্দুসমাজে মহিলাদের অধিকার-প্রসঙ্গে আমরা নানা অবস্থা দেখি। প্রথমে দেখি নারী পুরুষের সহিত সমান অধিকার ভোগ করছে। তারপর দেখি স্মৃতির যুগে তার অবস্থা খানিকটা অবনমিত হয়েছে। পরবর্তী কালে মধ্যযুগে নারীর অবস্থা চূড়ান্তভাবে অবনমিত হয়েছে। পরবর্তী কালে নানা মহাত্মার আনুকূল্যে এক দীর্ঘকালস্থায়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারী নিজের জন্মগত অধিকারে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আন্দোলনের আরম্ভ রামমোহন যখন সমাজসংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন তখন হতে এবং ভারতের স্বাধীনতালাভের পর যখন ডঃ আম্বেদকার রচিত হিন্দুকোড ভারতীয় লোকসভায় পাশ হয়, তখন তার সমাপ্তি।

এই আন্দোলনে বহু উদারহৃদয় মহিলা ও পুরুষ বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। পুরুষপ্রভাবিত সমাজে নারীর এই চূড়ান্ত দুর্দশা মোচনের প্রয়োজনীয়তা পুরুষের মনে সাধারণত অনুভূত হয় না। অধঃপতিত সমাজে পুরুষের স্বার্থ একদিন নারীকে পুরুষের ভোগের পাত্রী ও সেবাদাসীরূপে পরিণত করেছিল। এই সামাজিক সুবিধা দীর্ঘকালস্থায়ী আচরিত প্রথা হিসাবে সমাজে অনেক দিন অনুমোদিত হয়ে আসছিল। তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা-বোধ আপনা হতে জাগে না। তার জন্য প্রয়োজন লুপ্ত সমাজ-চেতনা ও বিবেককে বাহির হতে আঘাতের। তা এসেছিল একটি অভাবনীয় পথে—একটি আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসে ঘটনাচক্রে ইংরেজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। আরও এক বিস্ময়কর ব্যাপার, এ সাম্রাজ্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়নি, হয়েছিল একটি বণিকগোষ্ঠী দ্বারা। যাই হোক, শাসনকে সুচারুরূপে পরিচালিত করতে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং

এক্ট পাশ হল। সপরিষদ এক গভর্নর জেনারেল-এর তত্ত্বাবধানে সাম্রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা হল এবং বিচার বিভাগের কাজ নিষ্পন্ন করবার জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হল।

তার ফল হল সুদূরপ্রসারী। এতদিন রাজকার্য নিষ্পন্ন হত মধ্যযুগের প্রথায়। ফার্সি ছিল সরকারের সহিত যোগাযোগের এবং বিচারালয়ের ভাষা। এখন ইংরেজী ভাষার ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হল। আন্তরিকভাবে ইংরেজ হল এক নূতন সংস্কৃতির বাহক। এই সংস্কৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক এবং প্রযুক্তি-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তা বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নির্মাণ করতে শিখেছে, যন্ত্রে সূতা উৎপাদন করতে ও বস্ত্র বয়ন করতে শিখেছে। তা সতেজ, নব যৌবনে উদ্দীপিত। অপর পক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি জরাগ্রস্ত, নানা সংস্কারের বন্ধনে নিপীড়িত এবং এক অচলায়তন গড়ে সমাজ জীবনকে একান্ত-ভাবেই স্তিমিত করে দিয়েছে। জরার শৈথিল্য হতে জাগাতে, নিদ্রার নিস্তেজ ভাব দুর করতে আঘাত হানবার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবার ক্ষমতা ধারণ করে এই তরুণ সংস্কৃতি। এদেশে যখন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে এই নূতন সংস্কৃতির ধারকের উপর এদেশের শাসনভার অর্পিত হল, তখন সেই সঙ্গে ইংরাজী চর্চার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। ভাষা ও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে এই নূতন হাওয়ার ভারতের মানুষের মনে অনুপ্রবেশ ঘটল।

তার ফলে যা ঘটল তাকে আমরা বলে থাকি বাংলার 'রেনেসান্স'। 'রেনেসান্স' এর অর্থ হল নবজাগরণ। তা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল মধ্যযুগের শেষে যখন ফ্লোরেন্সে প্রাচীন লুপ্ত গ্রীক সংস্কৃতি আবার নূতন করে বিকাশ লাভ করেছিল। গ্রীক সংস্কৃতি যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি-সমন্বিত। বর্তমান ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি তারই উত্তরাধিকারী। এক্ষেত্রে ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যা ঘটেছিল তাকে নবজাগরণ বলা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যা ঘটেছিল তাকে কিন্তু ঠিক নবজাগরণ বলা যায় না। এখানে যা ঘটেছিল তা স্বতন্ত্র জিনিষ। একটি প্রাচীন জরাগ্রস্ত সংস্কৃতি একটি প্রাণবান তরুণ সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষে এসে জেগে উঠেছিল। তা নবীন সংস্কৃতির মধ্যে যা ভাল

পেয়েছিল তা গ্রহণ করেছিল। প্রাচীনকেও সম্পূর্ণ বর্জন করেনি; তার মধ্যে যা বর্জনীয় নয় তাকেও রেখেছিল। ফলে যা গড়ে উঠেছিল তা হল দুই বিভিন্নধর্মী সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত এক নূতন সংস্কৃতি। তাই হল নবভারতের সংস্কৃতি। এই সংঘাতের ফলে যে নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তাতে যাঁরা মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা প্রাচীন সাহিত্যের তথা ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

এঁদের নেতৃত্বে ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় বেশ ত্যাগ করে নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। এই সংঘাতের প্রভাব সমাজের সকল বিভাগে নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের আন্দোলনরূপে বিস্তার লাভ করেছিল। ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য স্বদেশচেতনা এবং নারীসমাজের উন্নয়ন—সব দিকেই তা পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু হল এই ব্যাপক আন্দোলনের একটি দিক—নারীসমাজের উন্নয়ন বিষয়ক আন্দোলন। এই আন্দোলন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত ইংরেজের মাধ্যমে নবীন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাতেরই ফলশ্রুতি। পাশ্চাত্য সমাজে নারী পর্দাপ্রথা হতে মুক্ত ছিল, নারীকে শিক্ষা হতে বঞ্চিত করা হত না। এই অভিনব সমাজব্যবস্থা চোখে দেখেও অনেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ ত তাঁর সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে এই প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্য দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করতে পাঠিয়েছিলেন।

নারীমুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয় রামমোহন থেকে। তাঁর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেকালের প্রচলিত নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথার প্রতি এবং তা রহিত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রামমোহনের পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীজাতির উন্নয়নের এবং পুরুষের সহিত সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন আন্দোলন করেন। নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা খুবই ব্যাপক ছিল। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকার কথাও উল্লেখ

করা যেতে পারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অনেক মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা ছিল। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং অচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের মনেও ভারতের সামগ্রিক কল্যাণ-চিন্তায় নারীসমাজের দুর্দশামোচনের প্রয়োজনীয়তার কথা উদয় হয়েছিল। এর জন্যই তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে কলিকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। নারীজাতির উন্নয়ন আন্দোলনে তাঁর ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

এই আন্দোলন বিংশ শতাব্দীতেও উপচে পড়েছিল। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের ফলে যদিও নারী-সমাজের কিছু উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল তবু নারীকে আপন অধিকার পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে আরও কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক জুড়ে এই আন্দোলন চলেছিল। তারপর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হবার সঙ্গে জাতির মুক্তি-আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলনরূপে দেশের সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর এবং তারই আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে হিন্দু কোডে নারীসমস্যারও একরকম নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে যাঁরা নারী উন্নয়ন আন্দোলনকে সজীব রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার নাম প্রথমেই মনে আসে। তারপরে যাঁরা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের দুজন হলেন একই পরিবারের সন্তান এবং পরস্পর ভগিনী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এঁরা হলেন দুর্গামোহন দাশের কন্যা সরলা রায় ও অবলা বসু। সরলা রায়ের স্বামী ছিলেন ডঃ প্রসন্নকুমার রায় এবং অবলা বসু আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সহধর্মিণী। আরও একজন শিক্ষাব্রতী নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন আচার্য মুরলীধর

বন্দোপাধ্যায়। তিনি এ বিষয়ে পারিবারিক আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরই পিতৃব্য শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপদেশে প্রথম বিধবা বিবাহ করেছিলেন।

আমরা এখন সংক্ষেপে দেখাব ভারতীয় সমাজে প্রাচীন কাল হতে কেমন ভাবে ক্রমশ নারী উচ্চস্থান হতে ভ্রষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে লোকাচার ও পুরুষের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সমাজে অধঃপতিত হয়েছিল। এই অধঃপতনের বেদনাদায়ক ইতিহাস তিনটি অধ্যায় দ্বারা চিহ্নিত। প্রথমে দেখি বৈদিক যুগে নারী সমাজের উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। পরের অধ্যায়ে দেখি নারী সম্বন্ধে সমাজের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে এবং ফলে সমাজে নারীর স্থান অনেক নীচে নেমে এসেছে। এটিকে স্মৃতির বা মনুর যুগ বলতে পারি। পরবর্তী কালে দেখি নারীর দুর্দশা চরম সীমায় অবনমিত হয়েছে। তখন পর্দাপ্রথা চালু হয়ে গিয়েছে। নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একেবারে উপেক্ষিত হয়েছে। পতি তখন নারীর একমাত্র গতিতে পরিণত হয়েছে। এমন কি পতির মৃত্যুর পর একই চিতায় আত্মাহুতি দেওয়াকে এক উৎকৃষ্ট আদর্শরূপে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমান ভাষণে এই দুঃখকর ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রস্তাব করি।

(২)

আমরা দেখি বৈদিক যুগে নারী সমাজে একটি সম্মানের স্থান অধিকার করত এবং এমন অনেক অধিকার ভোগ করত যা হতে তাকে পরবর্তী কালে বঞ্চিত করা হয়। এ বিষয়ে তথ্য বৈদিক সাহিত্য হতেই পাওয়া যাবে।

আমরা জানি নারীকে সহধর্মিণী বলে। কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুন্দর। সংসারে পুরুষ ও নারী সংসারধর্ম পালনে পরস্পর সহায়ক। তাই স্ত্রী স্বামীর সহধর্মিণী। বৈদিক যুগে নারী সত্যই সহধর্মিণীর ন্যায় আচরণ করত। সেকালে যজ্ঞ নিষ্পাদন ছিল ধর্মের বিশিষ্টতম অঙ্গ। আমরা দেখি বেদের একাধিক সূত্রে উল্লেখ আছে যে, নারী ও পুরুষ একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পাদন করছে। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৩-তম সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।

সেখানে এই উক্তিটি পাইঃ

"হে ইন্দ্র, মর্ত্য হোতা স্তোত্রাভিলাষী দেবতাদের স্তব করে স্ত্রী-পুরুষে যজ্ঞ নিষ্পাদন করছে।" (১।১৭৩।২)

এ হতে অনুমান করা যায় যে নারী ও পুরুষ উভয়েই একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করতেন। উভয়েরই হোতা হবার অধিকার ছিল।

পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্ততেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে আছেঃ

"যখন তুমি (অগ্নি) দম্পতীকে একান্তঃকরণ করে দাও, তখন তারা তোমাকে বন্ধুর মত গব্য দ্বারা সিক্ত করে।" (৫।৩।২)

এ থেকে মনে হয় বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করবার অধিকার ছিল। এর থেকে আমার মনে হয়, সেকালে পুরুষের মত নারীর একাধিক সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল ; তা না হলে নারীর যজ্ঞ করবার অধিকার কি করে আসে ?

আমরা জানি পুরুষের জন্য অন্নপ্রাশন হতে বিবাহ পর্যন্ত দশটি সংস্কার * এখনও চালু আছে। অপর পক্ষে বিবাহই নারীর একমাত্র সংস্কাররূপে স্বীকৃত। এ যে শুধু অনুমান, তা নয় ; এর সপক্ষে কিছু লিখিত প্রমাণও পাওয়া যায়।

নির্ণয় সাগর প্রেস হতে যে মনুস্মৃতি প্রকাশিত হয়েছে তার পরিশিষ্টে মনুর উক্তি বলে প্রচলিত কতকগুলি শ্লোক দেওয়া আছে। এই শ্লোকগুলি বোধায়ন সূত্রেও আছে। তাদের মধ্যে অন্যতম হল এই শ্লোকটিঃ

পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সবিত্রীবচনং তথা ॥

এ হতে বোঝা যায়, প্রচীনকালে মেয়েদের জন্য মৌঞ্জীবন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে মৌঞ্জীবন্ধন উপনয়নকেও সূচিত করে। তাদের সাবিত্রী মন্ত্রজপ এবং অধ্যাপনেরও অধিকার ছিল। গুরুর কাছে শিক্ষা না পেলে এ সব অধিকার স্থাপিত হবে কি করে ? সুতারাং এটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, নামকরণ প্রভৃতি

* দশ সংস্কার ; গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ণ, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ।

সংস্কারে পুরুষের যেমন অধিকার আছে নারীরও বৈদিক যুগে তেমন অধিকার ছিল। পরে অনুদার দৃষ্টি প্রণোদিত হয়ে পুরুষচালিত সমাজ নারীকে সে সব অধিকার হতে বঞ্চিত করে কেবল মাত্র বিবাহ সংস্কারকেই অপরিবর্তিত রেখে দিয়েছে। তার কারণও স্পষ্ট ; নারীর জন্য এই সংস্কার স্বীকৃত না হলে পুরুষেরও ত বিবাহ হয় না।

বৈদিক যুগে পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। হিন্দুকোড প্রবর্তিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তা অক্ষুন্ন ছিল। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন। এমন কি বেদের সূক্ত অংশেও পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার উল্লেখ পাই। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সংখ্যক সূক্তটির বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। সূক্তটির দেবতা হলেন সপত্নীবাধন অর্থাৎ যে দেবতা সপত্নীকে বাধ্য করে বা অপসৃত করে। তা হতেই বোঝা যায়, সে কালেও বিবাহিত নারী সপত্নীদ্বারা পীড়িত হত এবং অতিষ্ঠ হয়ে দেবতার কাছে অপসারণ প্রার্থনা করত। আরও কৌতুকের কথা, এই সূক্তের ঋষি হলেন নিজেও মহিলা, নাম ইন্দ্রাণী। নারী না হলে নারীর সমস্যা কে ভাল রকম অনুভব করবে? এখন সূক্তের প্রাসঙ্গিক অংশটির অনুবাদ উপস্থাপিত করা যেতে পারে ঃ

"হে ওষধি, তোমার পত্র উন্নতমুখ, তুমি স্বামীর প্রিয় হবার উপায় স্বরূপ··তোমার তেজ অতি তীব্র ; তুমি আমার সপত্নীকে দূর করে দাও।" (১০।১৪৫।২)

সেকালে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে কেউ আশ্চর্য হবে না ; কিন্তু নারীর বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল শুনলে অনেকেই নিশ্চিত অবাক হবেন। কিন্তু সে প্রথারও যে প্রচলন ছিল, বৈদিক সাহিত্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অষ্টম মণ্ডলের ৫৯ সূক্তের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাতে প্রসঙ্গত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে এবং তাঁরা যে একই সঙ্গে বাস করতেন একথা সরসভাবে বোঝাতে একটি উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করলে উপমাটির পরিচয় সহজেই মিলবে। বলা হয়েছে ঃ

"দুই জন অশ্বী, একই স্ত্রীর সহিত বাস করেন এমন দুই পুরুষের মত এক সঙ্গে বাস করেন।" (৮।২৯।৮)

উপমা সংগৃহীত হয়, কল্পিত নয়, বাস্তব অবস্থায় দৃষ্ট ঘটনা থেকে। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, একই নারীর একাধিক স্বামী বৈদিক যুগে থাকা সম্ভব ছিল।

আমার মনে হয়, বৈদিক যুগে বিধবা বিবাহও প্রচলিত ছিল। ঋগ্‌বেদে একটি সূক্ত পাই যেখানে একটি মৃত পুরুষ এবং তার বিধবা পত্নীর কথা বলা হয়েছে। সেখানে যে বর্ণনা আছে, তাতে দেখা যায়, মৃত স্বামীকে ভূমিতে প্রোথিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে; এবং স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে সমাধিস্থ করা হলে বিধবা পত্নীকে সংসারে ফিরে যেতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সূক্তটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

"এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করে মনোমত পতি লাভ করে অঞ্জন ও ঘৃতে স্পৃষ্ট হয়ে গৃহে প্রবেশ করুন।" (১০।১৮।৭)

"হে নারী, সংসারে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করতে যাচ্ছ সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যে তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিল, সে পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল সবই তোমার করা হয়েছে।" (১০।১৮।৮)

এ হতে স্পষ্টই বোঝা যায় পতির মৃত্যুর পর পত্নীকে আবার বিবাহ করে সংসারধর্ম পালন করতে উপদেশ দেওয়া হত। পতির মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি কর্তব্য শেষ হয়ে যায়; কাজেই বৈধব্য জীবন যাপন করা অর্থহীন—এমনই একটা ধারণা সেকালে সমাজ-জীবনে ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়।

হিন্দুর চোখে ঋষির স্থান সবার উচ্চে; কারণ তিনি বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা। আমরা দেখি ঋগ্‌বেদে যে অসংখ্য সূক্ত আছে তাদের মধ্যে অনেকগুলি মন্ত্রের ঋষির নাম মহিলা বলে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে তার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারেঃ

১। ১ম মণ্ডল ১৭৯ সূক্তের দেবতা রতি, ঋষি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা;

২। ৫ম মণ্ডল ২৮ সূক্তের দেবতা অগ্নি, ঋষি অত্রিকন্যা বিশ্ববারা ;

৩। ৮ম মণ্ডল ৯৬ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র, ঋষি অত্রিকন্যা অপালা ;

৪। ১০ম মণ্ডল ৩৯ ও ৪৯ সূক্তের দেবতা অশ্বিদ্বয়, ঋষি কক্ষীবৎ-কন্যা ঘোষা ;

৫। ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্তের দেবতা আত্মা, ঋষি অম্ভৃণ-কন্যা বাক্ ;

৬। ১০ম মণ্ডল ১৪৫ সূক্তের দেবতা সপত্নীবাধন, ঋষি ইন্দ্রাণী।

সুতরাং আমরা উপরের তালিকাতে ছয় জন মহিলা ঋষির নাম পাই। তাঁরা হলেন লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ঘোষা, বাক্ ও ইন্দ্রাণী। এঁদের মধ্যে বাক্ ঋষির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ সূক্তের মধ্যে গভীর তত্ত্বকথা আছে। পরবর্তী কালে উপনিষদের যুগে ব্রহ্ম বা আত্মার যে পরিকল্পনা বিকাশলাভ করেছিল এই সূক্তে বীজাকারে তার চিন্তা বিধৃত আছে। এর মূলকথা হল আত্মা সর্বব্যাপী। পুরাণের যুগে এই সূক্তটিকে বৈদিক দেবীসূক্ত বলে গ্রহণ করে শক্তিপূজক তার মহত্বকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমরা দেখি বৈদিক যুগে যেমন নারীকে সূক্তরচনার ভার দিয়ে তার সর্বাপেক্ষা সম্মানের কাজে অধিকার দেওয়া হয়েছিল, উপনিষদের যুগেও তার সেই মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় অনুরাগী দুই মহিলার উল্লেখ পাই। প্রথমা হলেন যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী। তিনি স্বামীর সম্পদকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারিণী হতে চেয়েছিলেন। এই কাহিনী বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তা সেকালের নারীর পরা বিদ্যার প্রতি আকর্ষণের পরিচয় দেয়। তা বলে যে, তখন তাদের চিন্তা এবং ভাবনা সংসারকে অতিক্রম করে দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হত।

অপর মহিলাটির নাম হল গার্গী। একই উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর বিষয়ে উল্লেখ আছে। তাঁর ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

সেকালে জনক রাজা দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার জন্য বিতর্ক-সভা ডাকতেন। তাতে বিখ্যাত দার্শনিকরা নিমন্ত্রিত হয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। যিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে প্রমাণিত হতেন, তাঁকে রাজা পুরস্কৃত করতেন। আমরা দেখি এই বিতর্কসভায় গার্গী'ই যাজ্ঞবল্ক্যের সব থেকে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নিয়েছেন। সুতরাং সে যুগে নারী ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা করত এবং সে বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে খ্যাতিও অর্জন করত। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, নারীর বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি সেযুগে পুরুষের সহিত সমান বলেই স্বীকৃত হত।

আমাদের একটা ধারণা আছে যে, মধ্যযুগে লীলাবতী নামে এক মহিলা ছিলেন যিনি গণিতে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তীর সত্যতা নাই। প্রকৃত সত্য হল এই; বিজ্জবিড় বা বর্তমান বিজাপুরের অধিবাসী ভাস্করাচার্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভবত প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' চারভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি ভাগের একটি নাম দেওয়া হয়েছিল; লীলাবতী, বীজগণিত, গ্রহগণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায়। সুতরাং লীলাবতী একটি গ্রন্থের একটি খণ্ডের নাম। কেন লীলাবতী নামকরণ হল সে বিষয়ে দুইটি কিংবদন্তী আছে। প্রথমটি বলে লীলাবতী ভাস্করাচার্যের বালবিধবা বা অনূঢ়া কন্যা ছিলেন এবং পিতা তাঁর নামেই এই নামকরণ করেন। দ্বিতীয় প্রবাদ অনুসারে তাঁর নিঃসন্তান পত্নী লীলাবতীর নামে এই নামকরণ। এই প্রসঙ্গে রমাতোষ সরকার প্রণীত, 'প্রাচীন ভারতের গণিত চিন্তা' দ্রষ্টব্য।

(৩)

মনুর যুগে অর্থাৎ স্মৃতির যুগে সমাজে নারীর অবস্থা অনেক অবনমিত হয়ে গিয়েছিল। তবে কিছু কিছু সুবিধা যে তখনও ছিল না, তা নয়। এ বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা মনুসংহিতার কাল সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নিতে পারি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে সম্ভব নয়। তবে মনে হয় তা মহাভারতের পূর্বে রচিত। দেখা যায় মহাভারতে মনুস্মৃতির ২৬০টি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য বলা যেতে পারে মনু

মহাভারত হতে তা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সংখ্যায় এত বেশী হওয়ায় এবং মনুসংহিতার কথা মহাভারতে উল্লিখিত থাকায় প্রথমটি ঘটারই বেশী সম্ভাবনা। প্রাচ্যবিদ্যাচার্য বেরিডেল কীথ-এর মতে মনুস্মৃতি খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ২০০-এর মধ্যে রচিত হয়ে থাকবে। (A. Berriedale Keith, Sanskrit Literature, Part III, Chap. XII, Sec. 2)

মনুর কালে নারীকে সম্মান দেখাবার উপদেশ পাই। মনু বলছেন ঃ

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া ॥

(৩।৫৬)

—অর্থাৎ যেখানে নারীগণ পূজিতা হন সেখানে দেবগণ প্রসন্ন হন ; যেখানে তাঁরা পূজিতা হন না, সেখানে সমস্ত ক্রিয়াই নিস্ফল।

তার যে একটা কারণ ছিল না, তা নয়। গার্হস্থ্য জীবনের শ্রী ও স্বাচ্ছন্দ্যের মেরুদণ্ড হল নারী। পরিবারের পরিবেশটি তারই আনুকূল্যে গড়ে ওঠে। তার কোলে সন্তান এলে সংসার আনন্দমুখরিত হয়। তার তত্ত্বাবধানে গৃহের শ্রী বর্ধিত হয়। সেটা সম্ভব করতে প্রয়োজন নারীর মনকে খুসী রাখা। তাই মনু বলেছেন ঃ

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥

(৯।২৬)

—অর্থাৎ সন্তানের জননী হিসাবে এবং গৃহের দীপ্তি হিসাবে নারী সদ্ব্যবহার পাবার অধিকারিণী। তাই মনুর মতে স্ত্রীর সঙ্গে শ্রীর কোনও পার্থক্য নাই।

তাই দেখি নারীর বিবাহিত জীবনকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। মনুর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি জন্মলগ্ন হতে বিভিন্ন বয়সে নানা বৈদিক সংস্কারের বিধান আছে। যেমন জাতকর্ম, নামকরণ, নিক্রমণ অর্থাৎ প্রকোষ্ঠ হতে বাহিরে আগমন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ। মনু এইসব সংস্কারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে কন্যা-সন্তানের পক্ষে উপনয়ন ব্যতীত অন্যগুলিও

প্রযোজ্য। তবে সেগুলি মন্ত্রপ্রয়োগ না করে সম্পাদন করতে হবে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

অমন্ত্রিকা তু কার্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমম্॥

(২।৬৬)

তবে মনুর নির্দেশ হল বিবাহ সংস্কার নারীর ক্ষেত্রেও পুরুষের সহিত সমান মর্যাদায় নিষ্পন্ন করতে হবে। তাঁর মতে উপনয়নান্তে পুরুষের গুরুগৃহে বাস ও অগ্নিপরিচর্যার স্থান অধিকার করে নারীর পতিসেবা ও সংসারের কাজ ঃ

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥

(২।৬৭)

অপরপক্ষে দেখি নারীর জীবনকে সংকুচিত করে পতিকেন্দ্রিক করে গড়ে তোলার আদর্শ গড়ে উঠেছে। সেকালে নারী বিদ্যাচর্চা করত, দার্শনিক তর্কসভায় পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত, এমন কি ঋষি হিসাবে বৈদিক সূক্ত রচনা করত। এখন সে অধিকার হতে তাকে বিচ্যুত করা হয়েছে। এখন হতে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হয়েছে এবং পতিসেবাই একমাত্র কর্তব্য বলে প্রচারিত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে মনুস্মৃতি হতে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

প্রথম বিধান হল নারীর সারা জীবনই পুরুষের অধীনে বাস করতে হবে ; তার কোনও অবস্থাতেই নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন বলে কিছু থাকবে না। এই প্রসঙ্গে নীচের শ্লোকটি দেখা যেতে পারে ঃ

বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥

(৫।১৪৮)

বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির এবং বৈধব্য অবস্থায় পুত্রদের অধীনে থাকতে হবে—এই হল নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে 'বশে' শব্দটির তাৎপর্য বিশেষ লক্ষণীয়। সর্বক্ষেত্রেই নারীর পুরুষের আজ্ঞাধীন থাকতে হবে, এমন কি পুত্রেরও।

দ্বিতীয় নির্দেশ হল, স্বামীকে কেন্দ্র করেই নারীর জীবন গড়ে উঠবে, এর অতিরিক্ত নারীর কিছুই কর্তব্য নেই। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

(৫।১৫৫)

--অর্থাৎ নারীর পতি হতে পৃথক যজ্ঞ নেই, ব্রত নেই, উপবাস নেই; কেবল পতির শুশ্রূষা করেই তার স্বর্গলাভ হয়।

এমন কি পতির মৃত্যুর পরও পতিই তার জীবনের ধ্রুবতারা হয়ে বিরাজ করবে, এমন উপদেশও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ না বলে উপদেশটি প্রয়োগ করছি এই কারণে যে, মনু কিছু বিকল্প ব্যবস্থাও রেখেছেন। তার বিষয় যথাসময়ে উল্লেখ করা হবে।

তাই দেখি পতি মৃত হলে মনু উপদেশ দিয়েছেন, আদর্শ পত্নীর কর্তব্য হবে বৈধব্য অবস্থায় থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা। তা করলেই অপুত্রক হলেও এমন সাধ্বী নারীর স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত বলে মনু আশ্বাস দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

মৃতে ভর্তকি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

(৫।১৬০)

অবশ্য এটা আদর্শ, কিন্তু বাধ্যতামূলক বিধান নয়। কারণ, মনু পরে স্পষ্টই বলেছেন যে, সাধ্বী নারীদের দ্বিতীয় বিবাহ উপদেশ দেওয়া হচ্ছে না। "ন দ্বিতীয়স্তু সাধ্বীনাং কাচিদ্ ভর্তোপদিশ্যতে।" স্পষ্টতই এটা উপদেশ, অবশ্য পালনায় নির্দেশ নয়।

মনুস্মৃতির যুগে এসত্ত্বেও নারীর কতকগুলি অধিকার স্বীকৃত ছিল যা দেখি পরবর্তী কালে প্রত্যাহৃত হয়েছে। সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া প্রয়োজন।

দেখা যায় মনুর বিধান অনুসারে নারীর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বীকৃত ছিল। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে। যে পিতার পুত্র-সন্তান নেই, কেবল কন্যা-সন্তান আছে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার কন্যার—মনু এই বিধান দিয়েছেন। আমরা জানি পরবর্তী কালে

ব্যবস্থা হয়েছিল যে, এই অবস্থায় কন্যা কেবল জীবনকালে পিতার সম্পত্তির উপস্বত্ব মাত্র ভোগ করিবে এবং দৌহিত্র মাতার মৃত্যুর পর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবে। সুতরাং মনুর বিধান নারীর কিছুটা অনুকূল ছিল। প্রাসঙ্গিক নির্দেশটি এই ঃ

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ॥

(৯।১৩০)

—অর্থাৎ আত্মাই ত পুত্র হয়ে জন্মায় এবং পুত্রের সঙ্গে দুহিতার কোনও ভেদ নেই; সুতরাং কন্যা থাকতে পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তি অন্যে কেন পাবে?

মনে হয় মনুর কালে নারীর শৈশব অবস্থায় বিবাহ প্রচলিত ছিল না। আমরা জানি পরবর্তী কালে গৌরীদানের আদর্শ হিন্দু-সমাজকে পেয়ে বসেছিল। মনুর ব্যবস্থা কিন্তু অন্য ধরণের। বলা হয়েছে উৎকৃষ্ট অভিরূপ বরকে কন্যা সম্প্রদান করতে হবে। এমন কি এও বলা হয়েছে যে, উপযুক্ত পাত্র যদি না জোটে তা হলে যৌবনবতী কন্যাকেও আমরণ অবিবাহিত রেখে দেবে, তবু গুণহীন পাত্রে অর্পণ করবে না। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

কামমামরণাৎ তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাৎ প্রযচ্ছেৎ তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

(৯।৮৯)

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু অধিকার নারীকে দেওয়া হয়েছে। প্রথম বলা হয়েছে যৌবনোদ্গমের পর তিন বছর অপেক্ষা করবে। তারপরেও যদি পিতা তাকে পাত্রস্থ না করে, তা হলে সে নিজে পতি নির্বাচন করে বিবাহ করবার অধিকারিণী হবে। এইভাবে স্বয়ংবরা হলে তার কোনও পাপ হয় না। (মনু ৯।৯১) সুতরাং দেখা যায়, সেকালে শিশুবিবাহ বা যৌবনোদ্গমের আগে বালিকাবিবাহের নির্দেশ ছিল না। এমন কি পিতা যদি কন্যাকে উপযুক্ত সময়ে পাত্রস্থ করতে অসমর্থ হতেন, তা হলে কন্যার আত্মনির্বাচিত পাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা ছিল এবং তা বৈধবিবাহ হিসাবে স্বীকৃত হত। তবে একেবারে যে বালিকাবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল তা মনে হয় না। মনুর ধারণায় পাত্র

ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্যের অনুপাত হওয়া উচিত এক-তৃতীয়, অর্থাৎ পাত্রের যা বয়স হবে পাত্রীর হবে তার তিন ভাগের এক ভাগ। সুতরাং মনু বলেছেন, পাত্রের বয়স যদি ৩৬* হয় তা হলে পাত্রীর বয়স হওয়া উচিত ১২ বছর এবং পাত্রের বয়স যদি ২৪ হয় তা হলে পাত্রীর বয়স হওয়া উচিত ৮ বছর (মনু ৯।৯০)। মনে হয় এই দ্বিতীয় নির্দেশ হতেই পরবর্তী কালে গৌরীদান প্রথা এত ব্যাপকভাবে প্রচারলাভ করেছিল।

আরও একটিও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। দেখা যায়, পরিত্যক্তা নারীর বা বিধবার বিবাহে মনুর আপত্তি ছিল না। সেকালে এক শ্রেণীর সন্তানের নাম ছিল পৌনর্ভব। তার অর্থ হল এই যে, যদি কোন নারী স্বামীদ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে বা বিধবা হয়ে আবার বিবাহ করে সন্তানের জন্মদান করে তা হলে সেই সন্তান হবে পৌনর্ভব।+ তার অর্থ তার মা পুনরায় ভার্যা হয়ে তাকে লাভ করেছে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুন র্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
(৯।১৭৫)

এই প্রসঙ্গে মনু একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন উপরের দুই ক্ষেত্রে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে তাকে সংস্কার বলে পরিগণিত করা হবে না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে সংস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। যদি সেই নারীর কৌমার্যহানি না ঘটে থাকে, তা হলে তার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিবাহ সংস্কারের ব্যবস্থা থাকবে। এই অবস্থায় পরিপূর্ণ বিবাহের মর্যাদা দেবার কারণ যুক্তির দিক হতে বিবেচনা করলে বিলক্ষণ পাওয়া যায়।

---

* মনু ৯।৯৪ তে ত্রিশ বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন ছত্রিশ নহে। সুতরাং ১ ঃ ৩ অনুপাতটি এক্ষেত্রে খাটে না। এতদ্ব্যতীত, কন্যার বয়স নয়, দশ, কিংবা এগারো এবং পুরুষের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ প্রভৃতি হইলেও তাহাদের বিবাহ মনুর অমনোনীত নহে। মনুর এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য মেধাতিথি-ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। —সঃ

+ এই বিষয়ে মতভেদ আছে। এইরূপ তথাকথিত বিবাহে কোনও সম্প্রদান কর্তা না থাকায় ইহা যথাশাস্ত্র মুখ্য বিবাহ নহে। মর্যাদা দেওয়া এক কথা আর মুখ্য শাস্ত্রীয় বিবাহ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া অন্য কথা। মনু যে দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (৯।১৫৯-৬০) এবং পুনর্ভব পুত্রের যে দায়ভাগ নির্দেশ করিয়াছেন (৯।১৬৫) তাহা হইতেই আলোচ্যমান বিবাহের স্থান বোঝা যায়। —সঃ

উপরের আলোচনা হতে দেখা যায় মনুর কালে নারী বৈদিক সমাজে যে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল তা হতে অনেকখানি অবনমিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে যুগে নারীর কিছু কিছু অধিকার ছিল। যেমন বিশেষ ক্ষেত্রে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ও অবস্থা বিশেষে স্বয়ং পতি নির্বাচন করবার অধিকার এবং পতিপরিত্যক্তা বা বিধবা হলে পুনরায় বিবাহ করবার অধিকার।

আমরা দেখব আরও কয়েক শতাব্দী পরে ধীরে ধীরে নারী তার নানা অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে পুরুষচালিত সমাজের হৃদয়হীন এবং স্বার্থপ্রণোদিত ব্যবস্থাপনায় একরকম পুরুষের দাসীতে পরিণত হয়েছে। এই অবনতি চূড়ান্ত অবস্থায় এসে পৌঁছায় সম্ভবত ইসলামের সহিত হিন্দু সংস্কৃতির সংযোগের পূর্ব্বেই। বৃহন্নারদীয় পুরাণে এমন কি সমুদ্রযাত্রাও নিষিদ্ধ হয়েছিল। তার অর্থ এই যে, হিন্দুর প্রাণশক্তি এমন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, সমাজ নিজেকে গুটিয়ে নিতে চেয়েছিল। যে হিন্দু অবাধে সমুদ্রযাত্রা করে শুধু ব্যবসায় নয়, উপনিবেশও স্থাপন করেছিল, তাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হল সমুদ্রযাত্রা বন্ধ করতে হবে। অথচ আমরা জানি প্রাচীন হিন্দুরা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিজেদের সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সুমাত্রা যবদ্বীপ বালিদ্বীপ প্রভৃতির অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিল। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে ঘিরে তাদের ভাস্কর্য সঙ্গীত নৃত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল। এমন কি এই দ্বীপগুলির মানুষ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তখনও তারা হিন্দুসংস্কৃতি পরিত্যাগ করেনি। এখনও বালিদ্বীপবাসীরা হিন্দু রয়ে গেছে।

বাহিরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করবে না, বাহিরের সঙ্গে সংযোগসূত্র ছিন্ন করে দেবে এবং কোনরূপে অচলায়তন সৃষ্টি করে নিজের যুক্তিহীন সংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থাকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রাখবে, এই ছিল যেন এই ধরণের ব্যবস্থার যুক্তি। এর প্রধান কারণ মনে হয় দুটি। প্রথম, একটি রক্ষণশীল মনোভাব যা সমাজব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রেখে দিতে বদ্ধপরিকর এবং দ্বিতীয়, নারীকে সমাজে

ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করে একান্ত হেয় অবস্থায় রাখতে বাধ্য করা।

জীবন্ত সমাজ গতিশীল হতে বাধ্য। কারণ, তার পরিবেশ চিরকাল এক থাকে না, তা নিত্য পরিবর্তনশীল। সেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সজীবভাবে বাঁচতে প্রয়োজন নূতন সমস্যা, নূতন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। প্রাচীন বলেই কোনও জিনিসকে চিরকাল অপরিবর্তিত অবস্থায় রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তা যদি নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হয়, তাকে রাখা যেতে পারে ; না হলে তাকে পরিত্যাগ করাই যুক্তিসম্মত। কিন্তু আমাদের দেশে এমন একটা রক্ষণশীলতার মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, যা কিছু প্রাচীন তা যুক্তিসম্মত হোক বা না হোক, পরবর্তীকালে তার উপযোগিতা থাকুক বা না থাকুক, তাকে বাঁচিয়ে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা চালান হয়েছে। এমন কি যা কোন শাস্ত্র দ্বারা অনুমোদিত নয়, লোকাচারের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তাকেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, তা বহুকাল প্রচলিত।

দ্বিতীয়ত, পুরুষের স্বার্থপরতা ধীরে ধীরে নারীকে সকল ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে বঞ্চিত করে অন্তঃপুরে বন্দিনী পুরুষের দাসীতে পরিণত করেছে। যে নারীর কাছে উচ্চতম বিদ্যাচর্চার অধিকার অবারিত ছিল, যে নারী একদিন বৈদিক যুগের মন্ত্রদ্রষ্টা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল, সে নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়েছিল। শিশু অবস্থায় বিবাহ দিয়ে গৌরীদান করে কন্যা সম্বন্ধে পিতা নিজের কর্তব্য সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরে নিতে আরম্ভ করল। ফলে স্ত্রীশিক্ষা নিন্দনীয় বিষয় হয়ে উঠল। বাংলায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও একটি কথা প্রচলিত ছিল, যে, মেয়ে বিদ্যাচর্চা করে সে বিধবা হয়। অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় তার সম্ভবনাও ঘুচে গিয়েছিল।

এই ব্যবস্থা পুরুষের স্বার্থের সপক্ষে দুই ভাবে কাজ করেছিল। উচ্চশিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়ায় নারীর উন্নততর জীবনের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। ফলে নারীর একমাত্র অবলম্বন হল ধর্ম। তার

স্বাভাবিক ধর্মবোধ তাকে অন্ধভাবে সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখাই ধর্মের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে শেখাল। কাজেই সামাজিক ব্যবস্থাকে অন্ধভাবে প্রতিপালন করা এবং প্রয়োগ করবার আগ্রহ তার বেড়ে গেল। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের অধঃপতিত সমাজের বেশীর ভাগ ব্যবস্থাই নারী কল্যাণের বা স্বার্থের পরিপন্থি। ফলে নারী নিজেকে নিজেই শৃঙ্খলিত রাখতে পুরুষের প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়াল। মেয়েদের উচ্চস্বরে কথা বলতে নেই, মুখ হতে ঘোমটা সরাতে নেই, বাহিরের পুরুষের সাথে কথা বলতে নেই ইত্যাদি হাজারো বিধান প্রয়োগ করতে নারী নারীর প্রশাসক হয়ে দাঁড়াল। এ যেন যে শৃঙ্খলিত, সে-ই শৃঙ্খলকে ধরে রাখতে চায়

দ্বিতীয়ত এই অস্বাভাবিক অবস্থা সম্ভব হয়েছিল নারীকে শিক্ষাদান হতে বঞ্চিত করার ফলেই। যে একান্ত নিরক্ষর সে নিজের অধিকার বুঝবে কি করে? যাকে বদ্ধিবৃত্তির চর্চার আদৌ সুযোগ দেওয়া হল না, সে নিজের কল্যাণ বা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ কোথায়, তা বোঝার ক্ষমতা রাখে না। ফলে সমাজের শাসনকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়াই কর্তব্য বিবেচনা করে। এমন কি যুক্তি দিয়ে বিচার করে কোনও প্রচলিত ব্যবস্থাকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাও নিষ্ঠার সহিত পালন করে চলে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের মা-দিদিমাদের যুগের একটি প্রাত্যহিক কর্মের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের গৃহিনীর প্রাত্যহিক একটি কর্ম ছিল বাড়ীময় গোবর জল ছড়িয়ে তাকে শুদ্ধ করা।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি মৌলিক অধিকার হতে নারীকে বঞ্চিত করার কথা উল্লেখ করে এই ভাষণটি শেষ করা যেতে পারে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারীর পতিকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রার নির্দেশ। আদর্শ নারী হবেন পতির ছায়ার মতন অনুগামিনী। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের দিক হতে এই ব্যবস্থা যে কত ক্ষতিকর, সে দিকটা আদৌ ভেবে দেখা হয়নি; পুরুষের স্বার্থকেই এখানে বড় করে দেখা হয়েছে। কালিদাসের

কল্পিত আদর্শ পত্নী হবেন গৃহিনী এবং সচিব সে শিক্ষা কোথায় ভেসে গেছে। সেকালে তাই দেখতাম মেয়েদের উল দিয়ে কাপড়ে লেখা ফোটাতে শিক্ষা দেওয়া হত 'পতি পরম গুরু'। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেকালের শিক্ষিতা মহিলা স্বামীকে চিঠিতে সম্বোধন করতেন 'শ্রীচরণেষু' বলে এবং চিঠি শেষ করতেন 'সেবিকা'।

এর জন্যই পতি পরলোকে গমন করলে নারীর বৈধব্য অবস্থা অক্ষুন্ন রেখে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের ব্যবস্থা। যা ছিল মনুর কালে একটি বিকল্প আদর্শ মাত্র, তা হয়ে উঠল এক আবশ্যিক নির্দেশ। এ নির্দেশ কুমারী অবস্থায় বিধবা হয়েছে এমন নারীর উপর যেমন প্রযোজ্য, তেমন প্রৌঢ়া বিধবার উপরও প্রযোজ্য। শুধু নিরামিষ আহার নয়, লোকাচারকে ভিত্তি করে অনেক নিরামিষ খাদ্যও তার নিষিদ্ধ হল, যেমন ইঁচড়, মুসুর ডাল। একাদশীর দিনে ফলমূল আহারের পরিবর্তে নির্জলা উপবাস রীতিও গড়ে উঠল।

সম্ভবত এইভাবেই সহমরণ-রীতিরও প্রসার ঘটেছিল। সতী প্রথার অনুমোদন কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। মনুসংহিতাতে তার অনুমোদন ছিল না। অথচ দেখি ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সারা ভারত জুড়ে হাজার হাজার সতীদাহ প্রতি বছর ধর্মের অঙ্গ হিসাবে সংঘটিত হচ্ছে। সমাজ অধঃপতিত হলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয়, হৃদয়বৃত্তিও কতখানি শুকিয়ে যায়, এই সহমরণ-প্রথা তার উদাহরণ। এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থার হৃদয়হীনতা হিন্দুকে আদৌ বিচলিত করত না, করত সেকালের ইংরেজ প্রশাসকদের এবং তারা সরকারকে এই প্রথা রহিত করবার জন্য বার বার অনুরোধ করে চিঠি লিখত।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ছিল অন্তঃপুরে অবরোধ প্রথা। প্রাচীনকালে তা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। উপনিষদে দেখি প্রকাশ্য তর্কসভায় মহিলা দার্শনিক পুরুষের সংগে সমানে প্রতিযোগিতা করেছেন। এমন কি রাজপরিবারেও তা শিথিল ছিল বলে মনে হয়। তা না হলে সীতার রামের সহিত চৌদ্দ বছরব্যাপী বনবাস সম্ভব হল কি করে? মহাভারতে দেখি

ধীবররাজের কন্যা সত্যবতী নৌকা নিয়ে যাত্রী পার করতেন।

অনেকের ধারণা, এই অবরোধ প্রথা মুসলমান সংস্কৃতির সংস্পর্শ হতে হিন্দুসমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। আমার মনে হয় তার সপক্ষে কোনও প্রবল যুক্তি নেই। মুসলমান সমাজে অবরোধ বা পর্দাপ্রথা খুবই কঠোর ছিল ; সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অবনতির যুগে হিন্দুসমাজের মধ্যেও অনুরূপ চিন্তার অনুপ্রবেশ মুসলমানসমাজের সংস্পর্শে আসবার আগেই যে ঘটেছিল তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই ব্যবস্থার বীজাকারে মনুর নির্দেশের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মনুর এই শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

পরস্ত্রিয়ং যোহভিবদেৎ তীর্থেহরণ্যে বনেহপি বা।
নদীনাং বাপি সংভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ ॥
(৮।৩৬৫)

এর অর্থ হল, যে পুরুষ তীর্থে, অরণ্যে, বনে বা নদীসংগমে পরস্ত্রীর সহিত কথা বলবে তাকে 'সংগ্রহণ' দণ্ড দিতে হবে। সংগ্রহণ দণ্ড হল সহস্র পণ দণ্ড, এক হাজার মুদ্রা জরিমানার মত। এই উদ্ধৃতি দুটি কথা প্রমাণ করে। প্রথম, নারীদের অন্তঃপুরে ঠিক তখনও আবদ্ধ রাখা হত না ; তাদের নানা স্থানে ভ্রমণের অধিকার ছিল। দ্বিতীয়, তা সত্ত্বেও পরপুরুষের সহিত তার আলাপ শুধু নিন্দনীয় নয় দণ্ডনীয়ও ছিল।[১]

আর একটি শ্লোক পাই যা আরও তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু অক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ ॥
(৯।১২)

এর অনুবাদ দাঁড়ায় এইঃ পুরুষের[২] নির্দ্দেশে গৃহ রুদ্ধ থাকলেও নারী অরক্ষিতা। যারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করে তারাই

১। পরপুরুষের সহিত আলাপ করায় নারী নিন্দনীয় বা দণ্ডনীয় - মনুর উক্ত শ্লোক হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না ; পরস্ত্রীর সহিত অসদুদ্দেশ্যে আলাপকারী পুরুষেরদণ্ডে র কথাই কেবলমাত্র ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে। সংগ্রহণের প্রকৃত অর্থ মনুর ৮।৩৫৭ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। —সঃ

২। মূলে পুরুষের বিশেষণ 'আপ্তকারী' আছে। মেধাতিথিভাষ্য অনুসারে আপ্তকারীর অর্থঃ যাহারা যে সময়ে যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন করে, অর্থাৎ অন্তপুররক্ষী—কঞ্চুকী। সঃ

সুরক্ষিতা। এর মধ্যে একটি উৎপ্রেক্ষা এসে পড়ে যে, এমনও সেকালে ব্যবস্থা ছিল যে, পুরুষজাতি সেকালে অনেক ক্ষেত্রে তাদের মেয়েদের অন্তঃপুরে অবরোধ করে রাখত। তার থেকেই সম্ভবত 'অন্তঃপুরিকা', 'অসূর্যম্পশ্যা' ইত্যাদি শব্দগুলির উৎপত্তি। এমনও কঠোর অবরোধ ব্যবস্থা ছিল যে, সূর্যকেও দেখতে দেওয়া হত না। কথাগুলি সংস্কৃত কথা। তাই মনে হয় অবক্ষয়ের দিনে পুরুষের স্বার্থ বুদ্ধি নারীকে অন্তঃপুরে অবরোধের ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তী কঠোর অবরোধপ্রথা তারই স্বাভাবিক পরিণতি। মুসলমান সমাজের পর্দাপ্রথা হয়ত সেই প্রবণতাকে আরও বৃদ্ধি করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারীমুক্তি আন্দোলনে রামমোহনের ভূমিকা

(১)

রামমোহন একটি বহু-বিতর্কিত নাম। তাঁর জীবনকালে তিনি নিজে অনেক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। মৃত্যুর পরে বাংলার নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা নিয়ে দারুণ বিতর্ক এখনও চলছে। এমন কি তাঁর জন্মতারিখ নিয়েও বিতর্ক। কেউ বলেন তিনি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কেউ বলেন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় তারিখটি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মেনে নিয়েছিলেন এবং ব্রিস্টলে তিনি যে সমাধি-মন্দির নির্মাণ করেন তাতে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরিবার হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর জন্মতারিখ নির্দিষ্ট করেছেন। সম্প্রতি দ্বিশতবার্ষিক জন্মোৎসবের তারিখ নির্ধারিত করবার জন্য সরকার যে বিশেষজ্ঞের সমিতি নিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। এই সব কারণে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁর জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থায় ১৯৭২-৭৪ পর্যন্ত দুই বৎসর ধরে উৎসবের আয়োজন করেন।

তাঁকে নিয়ে এমন বিতর্ক গড়ে ওঠবার সম্ভবত দুটি কারণ ছিল। প্রথমত তাঁর জীবিত অবস্থায় তাঁর স্বাধীন যুক্তিভিত্তিক মত

প্রচারের দুঃসাহসের জন্য তিনি একদিকে যেমন ইংরেজ মিশনারীদের সহিত বিতর্কে যুক্ত হয়ে পড়েন, তেমনি অপরদিকে রক্ষণপন্থী হিন্দু-সমাজের সহিতও বিতর্ক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। ফলে মৃত্যুর পরও তাঁর সম্পর্কে হিন্দুসমাজের মানুষের মধ্যে একটি প্রতিকূল মনোভাব রয়ে গিয়েছে। অপরপক্ষে এক নূতন সংস্কারপন্থী সমাজের প্রবর্তক হিসাবে তিনি এই সমাজের মানুষের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেছেন। তাঁরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁদের প্রভাব প্রচুর এবং শিক্ষার গুণে তাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

ফলে এমন একটি পরিবেশ গড়ে উঠল যা বিতর্ক উৎসাহিত করে। তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মানুষ নূতন আন্দোলনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই তাঁকে পথিকৃতের ভূমিকা দিতে দ্বিধা করলেন না। অপরপক্ষে হিন্দুসমাজের চিন্তানায়করা তার প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। এমন কি তিনি এক অবৈধ সন্তানের পিতা বলে প্রমাণ করবারও চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক দ্বিশতবার্ষিক উৎসবে এই বিতর্ক কতখানি তিক্ততা ধারণ করেছে তা আমরা অনেকেই অবগত। বিষয়টি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক না হওয়ায় বিস্তারিতভাবে এর মধ্যে প্রবেশ করবার প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে আমার ধারণায় একজন নিরপেক্ষ গবেষক দিয়ে এ বিষয়ে একটি আলোচনা হওয়া উচিত। তা না হলে রামমোহনের প্রতি আমাদের কর্তব্য যথোচিতভাবে সম্পাদন করা হবে না।

এত বিতর্ক সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, রামমোহন একজন শক্তিধর অনন্যসাধারণ মানুষ ছিলেন। মেধা, সাহিত্য-কীর্তি, সহৃদয়তা, অন্যায়ের বিরোধিতা, শিক্ষা সম্বন্ধে প্রগতিশীল চিন্তা এবং উপাসনা-রীতির সংস্কারে আগ্রহ তাঁর জীবনের নানা কীর্তিতে সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে। এর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া অসঙ্গত হবে না।

রামমোহনের জ্ঞানপিপাসার সীমা ছিল না। অতি অল্প বয়সে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় অধিকার স্থাপন করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'তুহ ফাৎ উল্ মুবাহ্‌হিদ্দীন' নামে একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা আরবী ভাষায় লিখিত এবং মূল অংশ ফারসী ভাষায় লিখিত। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মিরাত

উল্ আখ্‌বার' নামে একটি ফারসী পত্রিকা স্থাপন করেন। বাল্যে রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পান নি। তিনি ইংরাজীতে অধিকার স্থাপন করেন তাঁর বন্ধু ও মনিব ডিগবি নামে এক পদস্থ কর্মচারীর সহযোগিতায়। ফলে তিনি এমন ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, তাঁর ইংরাজী রচনার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তিনি যখন ব্যাপ্টিস্ট মিশনের দুই পাদ্রীর সহযোগিতায় বাইবেলের অংশ অনুবাদের ভার নেন তখন সেই প্রসঙ্গে হিব্রু ভাষাও আয়ত্ত করেন। তাঁর ধর্মপিপাসা তাঁকে সংস্কৃতে অধিকারলাভে উৎসাহিত করে। তিনি সংস্কৃতে কতখানি বৎপত্তিলাভ করেছিলেন তার প্রমাণ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বেদান্তগ্রন্থ'। ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ব্যতীত তাতে একটি মূল্যবান ব্যাখ্যা সংযুক্ত ছিল। তাঁর চেষ্টায় একই সময় বাংলায় পাঁচখানি প্রাচীন উপনিষদের অনুবাদ হয়। পরিণত বয়সেও তাঁর জ্ঞানপিপাসা শিথিল হয় নি। দেখা যায় বিলাতে প্রবাসকালে তিনি যখন একবার প্যারিসে যান তখন ফরাসী ভাষা চর্চা আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে উডফোর্ডকে লিখিত তাঁর পত্রে তিনি এ বিষয় উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আরও কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বাংলা সংবাদ পত্রও প্রবর্তন করেন। তা তাঁর মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিল। এইটুকু বিবরণই তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দেবে।

এমন মানুষের মধ্যে যেমন আশা করা যায়, ঔদার্য ও সৌজন্যবোধ পরিপূর্ণভাবে পরিস্ফুট ছিল। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার জন্য তিনি নানাভাবে নিপীড়িত ও নিন্দিত হয়েছিলেন। রক্ষণপন্থী হিন্দুসমাজের মানুষ যে তাঁর প্রতি নানা অপ্রিয় উক্তি ও কুৎসা প্রচার করতেন তার প্রমাণ আছে। তিনি নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী বিগ্রহপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবু প্রাচীনপন্থী হিন্দুর ধর্মবোধের উপর আঘাত হানতে চাননি। এ বিষয় তাঁর মনোভাব ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রাস্ট ডীড রচিত হয় তাতে প্রতিফলিত আছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশটির এখানে

অনুবাদ স্থাপন করা যেতে পারে ঃ

"উপাসনা বা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে, যে প্রাণী বা জড়পদার্থকে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী কর্তৃক পূজার পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তার নিন্দা বা অবহেলা করা হবে না, বা ঘৃণার ভঙ্গীতে উল্লেখ করা হবে না।"

তাঁর অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম-প্রবণতার দৃষ্টান্ত মিলবে তাঁর নারীজাতির দুর্দশা মোচনের চেষ্টা হতে। তা-ই বর্তমান ভাষণের আলোচনার বিষয়। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে পরিপূর্ণ আলোচনা হবে।

দেখা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের যে অংশে প্রচণ্ডতম আঘাত এসেছিল, তা হল ধর্মের ক্ষেত্রে এবং সে সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে রামমোহনের নেতৃত্বে। হিন্দুরা ঈশ্বরকে বিগ্রহ আকারে পূজা করতে অভ্যস্ত। নূতন সংস্কৃতির বাহক হয়ে যারা এল, তারা তাকে পৌত্তলিকতা বলে নিন্দা করল। এই নিয়ে যে সংঘাত সৃষ্টি হল, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেকগুলি দশক জুড়ে বিস্তৃত। বিচিত্র তার ইতিহাস। তার সঙ্গে তুলনা চলতে পারে বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনোত্তর যুগে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংঘাতের ইতিহাসের সঙ্গে। এখানে প্রশ্ন হল বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্র গৃহীত হবে, না গণতন্ত্র গৃহীত হবে। সে সংঘাত এখনও চলছে। অনুরূপভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও বিতর্কমূলক বিষয় ছিল বিগ্রহহীন উপাসনা ভাল, না প্রতীকভিত্তিক উপাসনা ভাল। তার মীমাংসা হয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনে। বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়।

রামমোহনের শক্তি ও সামর্থ্যের অধিক অংশই নিযুক্ত হয়েছিল এই ধর্ম-আন্দোলনে। তিনি বিগ্রহপূজার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতি হল ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তন। এ বিষয়টিও অপ্রাসঙ্গিক হলেও তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, তা দেখায় তাঁর স্বাধীন চিন্তার প্রতি আকর্ষণ। রামমোহনের নিজস্ব মতে চলবার ইচ্ছা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর ধর্মচিন্তায়। দেখা যায়,

প্রাচীন সংস্কারের প্রভাব তথা চিত্তাকর্ষক প্রলোভন তাঁর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

এই প্রবন্ধে দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিগ্রহ পূজার রীতি তাঁর ভাল লাগেনি। যিনি অনন্ত জগতের আধার তাঁকে বিগ্রহের মধ্যে স্থাপন করবার পেছনে তিনি কোনও যুক্তি খুঁজে পাননি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতা রীতি' দেশের অকল্যাণ সাধন করছে এবং সেই কারণে, 'এই ভ্রান্তির দুঃস্বপ্ন হতে তাদের জাগ্রত করবার' ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন (Abridgement of Vedanta)। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন এবং পরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। তার জন্য সমাজের রক্ষণশীল অংশের তিনি একান্ত বিরাগভাজন হন, কিন্তু তাঁরা তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। এমন কি তাঁর মাতাও তাঁর প্রতি বিরূপ হন।

দ্বিতীয়ত তিনি খৃষ্টধর্মের নৈতিক আদর্শের উন্নতমানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এই সময় তিনি ব্যাপ্টিস্ট মিশনের দুই পাদ্রীর সহায়তায় চারটি গসপেল-এর বাংলা অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। এঁদের অন্যতম ছিলেন উইলিয়ম অ্যাডাম ; স্বাধীন চিন্তার ফলে রামমোহনের ধারণা হয় খৃষ্টধর্মের ত্রিতত্ত্ব যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না। ঈশ্বরের অতিরিক্তভাবে তাঁর পবিত্র আত্মার (Holy Ghost) এবং খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে কল্পনা তাঁর মতে অযৌক্তিক। ফলে খৃষ্টধর্মের আর বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদরূপ থাকে না। তাঁর যুক্তিকে স্বীকার করে নেওয়ায় আড্যাম তাঁর নিজ গোষ্ঠী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন।

এর আনুসঙ্গিক ফল হিসাবে তিনি মিশনারীদের সঙ্গে তুমুল বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেব তো তাঁকে 'intelligent heathen' বলে উপহাস করেন। তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি দেখে কলিকাতার বিশপ তাঁকে খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করতে বলে এই প্রলোভন দেখান যে, তা হলে 'তিনি জীবনে ও এবং মরণান্তে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ, উভয় দেশেই সম্মানিত হবেন

এবং বর্তমান কালের ভারতীয় “এপসল” (apostle) হিসাবে উত্তরপুরুষের নিকট খ্যাত হবেন।’ তিনি সে প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখান করেছিলেন।

সমাজের নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের পথিকৃৎ হিসাবে ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক এখনও চলেছে তা বাদ রেখেও একথা নিশ্চিত বলা চলে যে তিনি ভারতের নবজাগরণের পথ প্রস্তুত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনিই ভারতের ঘুম ভাঙ্গানিয়া। প্রাচীন জরা-জর্জরিত সমাজকে যুক্তিহীন সংস্কার এবং আচার এমন নির্জীব করে তুলেছিল যে, তাকে ঘিরে সত্যই এক অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছিল। রামমোহনই প্রথম তার প্রাচীর ভেঙ্গে বাহিরের আলো বাতাস উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

প্রাচীনকে ভেঙ্গে নূতনকে গড়বার পথ প্রস্তুত করতে দুটি গুণের প্রয়োজন। প্রথম হল স্বাধীন চিন্তা করে যা পাব তা প্রচার করার দুঃসাহস। রামমোহনের সে গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল, সে বিষয় এখনি যে তথ্যগুলি স্থাপন করা হল তার দ্বারাই প্রমাণিত হবে। দ্বিতীয় কথা হল, নতুন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত প্রাচীন সংস্কৃতির সংঘাত ঘটাবার জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রচার। নূতন সংস্কৃতি বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তা বিশ্বাসবাদকে ত্যাগ করে যুক্তিবাদকে গ্রহণ করেছে। ভারতের জরাগ্রস্ত সংস্কৃতির ঘুম ভাঙাতে এই নূতন সংস্কৃতির সহিত সংঘাতের প্রয়োজন। তার জন্য দরকার ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে দেশের মানুষের কাছে সহজলভ্য করা। এ বিষয় যাঁরা প্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন রামমোহন তাঁদের অন্যতম।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব এসে পড়ে। এ কথা ঠিক যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজে উদ্যোগী হয়ে ইংরাজী শিক্ষার এদেশে প্রবর্তনে বিরোধী ছিল। এ প্রসঙ্গে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অফ ডিরেকটারদের একজন মন্তব্য করেন যে, ‘যুক্তিসম্মত বুদ্ধি উপদেশ দেয় যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে, যে শিলাখণ্ডের আঘাতে আমেরিকার ক্ষেত্রে আমাদের বিপর্যয় ঘটেছে, তাকে দূরে রেখে পরিহার করে চলা।’

(ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী, পৃঃ ৯৫)। তাই দেখি, দেশী প্রথায় শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সরকার বারাণসী সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এবং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এমন কি হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরবর্তী কালেও কলিকাতায় আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করতে উদ্যোগী হন।

সুতরাং হিন্দু কলেজ বেসরকারী প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। তাই হয়েছিল প্রথম পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের মিলন সোপান। তার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল ঃ "তাকে সেই মূল স্রোতে পরিণত করা যার সাহায্যে প্রকৃতজ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান) ইউরোপীয় উৎস হতে ভারতীয় মনে সংক্রামিত হবে!" এই প্রসঙ্গে রামমোহনের হিন্দু কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। মোটামুটি যাঁরা প্রমাণ করতে চান তাঁর কোন যোগ ছিল না, তাঁদের মূল অস্ত্র এই তথ্য যে, রামমোহন প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের সময় কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেনি। কিন্তু যিনি প্রগতিশীলতায় বিশ্বাসী তিনি যে তাতে বিশেষ বাধ্য না থাকলে প্রকাশ্য ভূমিকা নেবেন না, তা হওয়া সম্ভব নয়। এ বিষয় হিন্দু কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্যার হাইড ইস্ট-এর মন্তব্যই সব থেকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। তিনি ১৬।৫।১৮১৬ তারিখে জে হ্যারিংটনকে যে চিঠি লিখেছেন, তাতে উক্তি করেছেন যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা সভায় একজন রামমোহনের চাঁদা দানের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি করেন এই যুক্তিতে যে, তিনি হিন্দুধর্মবিদ্বেষী। পিয়ারীচরণ মিত্র বলেন, তার ফলে রামমোহন প্রকাশ্যভাবে হিন্দু কলেজ স্থাপনে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এই কাহিনী তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি তথ্য পাই যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্যালকাটা ক্রিশ্চান অবসারভার (Calcutta Christian Observer)-এর জুলাই ১৮৩২ সংখ্যায় বলা হয়েছে ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রসঙ্গ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের 'আত্মীয় সভায়' প্রথম উত্থাপন করেন।

রামমোহনের মতিগতি বিচার করলে তিনি যে তার সমর্থন করেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই সকল তথ্য হতে মনে হয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সহানুভূতি ও আগ্রহ ছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি হেদুয়ার নিকট এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ তাঁর প্রথম পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে সেই বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফকে কাছেই অনুরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ভূমি সংগ্রহ করে দেন। তা-ই বর্তমানে স্কটিশ চার্চ স্কুল ও কলেজে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষানীতি সম্বন্ধে রামমোহনের প্রগতিশীল মত পরিষ্কার-ভাবে ফুটে ওঠে কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভূমিকা হতে। তখন লর্ড আমহার্স্ট ভারতের গভর্নর জেনারেল। সরকারের একটি নূতন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সংকল্প যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন রামমোহন ১১।১২।১৮২৩ তারিখ চিহ্নিত একটি দীর্ঘ পত্র লর্ড আমহার্স্টকে লেখেন। তাতে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলি বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তাদের মর্ম এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

তিনি লেখেন, তাঁর আশা ছিল সরকার এখানে 'তৎকালীন ইয়োরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষণের' ব্যবস্থা করবেন। পরিবর্তে হিন্দু পণ্ডিত পরিচালিত একটি সংস্কৃত শিক্ষালয় স্থাপনের কথা শুনে তিনি হতাশ হয়েছেন। তাতে এ দেশের তরুণরা দু-হাজার বছর পূর্বে যা শিখত তাই শিখবে।

তারপর তিনি সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন সংস্কৃত একটি কঠিন ও দুরূহ ভাষা। প্রথমত সংস্কৃত ব্যাকরণের ওপর অধিকার স্থাপন করতেই বার বছর কেটে যাবে। বেদান্তের সূক্ষ্ম জটিল দার্শনিক চিন্তা শিক্ষার্থীদের সমাজে ভবিষ্যৎ জীবনে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য ঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারবে কিনা

সন্দেহ। কারণ তা শিক্ষা দেয় বিশ্ব স্বপ্নবৎ মায়া; এ শিক্ষা ইহজগতের প্রতি মানুষকে উদাসীন করে দেয়। মীমাংসা পড়েই বা কি হবে? কারণ তা বেদের মহিমা কীর্তনে মুখ্যত নিযুক্ত। ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই বা ব্যবহারিক জীবনে কি কাজে লাগবে? এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই ব্যবস্থা ইয়োরোপের ক্ষেত্রে লর্ড বেকন-এর পূর্বে যে নূতন সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সংস্পর্শবর্জিত শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গেই তুলনীয়।

সুতরাং তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ভারত সরকারের যদি ভারতীয় অবস্থার উন্নতি সাধনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে 'আরও উদার আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থায়' উদ্যোগী হওয়া উচিৎ এবং তাতে 'গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা এবং অন্য উপযোগী বিজ্ঞান' শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় রামমোহন এমন শিক্ষাব্যবস্থা চেয়েছিলেন, যা ভারতকে মধ্যযুগের অন্ধকার হতে বর্তমান যুগে প্রবেশ করতে সাহায্য করবে। প্রাচীন অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙ্গে পশ্চিমের হাওয়া আমাদের মধ্যে প্রবাহিত করবার প্রয়োজনীয়তা তিনি পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে ঘিরে যতই বিতর্ক থাকুক, তাঁর সপক্ষে যে সব দাবী করা হয়েছে তাদের যতই ভূমিসাৎ করবার চেষ্টা করা হক্, এ কথা অনস্বীকার্য রয়ে যায় যে, রামমোহন নবযুগের প্রবর্তক, তিনি ভারতের ঘুম ভাঙানিয়া, তিনি নবভারতের পথিকৃৎ।

(২)

রামমোহনের প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল নিশ্চিত ধর্ম-সম্পর্কিত সংস্কার। কিন্তু তাঁর সহানুভূতি-পরায়ণ মন নারীজাতির প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিল। সমাজে নারীজাতির উপর নানাভাবে অত্যাচার তাঁকে এ বিষয় প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য চূড়ান্ত অবিচারের পরিচয় পওয়া যায় সতীদাহ-প্রথার প্রচলনে এবং সেই প্রসঙ্গেই সমাজে নারীজাতির অধঃপতনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

একটি কাহিনীতে আছে যে, তাঁর পরিবারে একবার সতীদাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই কারণেই তিনি সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করবার সিদ্ধান্ত করেন। এই কাহিনীটি হল এই ঃ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যু হলে তাঁর বিধবা পত্নী সতী হয়ে আত্মাহুতি দেবার সংকল্প করেন। রামমোহন তাঁকে সেই সংকল্প পরিত্যাগ করাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হন না। চিতায় আগুন জ্বলে উঠলে তিনি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বাহিরে আসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর আত্মীয় ও পুরোহিতের দল বাধা দেন। এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য চোখে দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি এই বর্বর প্রথা রহিত করবেন। কাহিনীটি কোনো লিখিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। রাজনারায়ণ বসু নাকি তাঁর পিতার নিকট এই কাহিনী শুনেছেন।

রামমোহনের অন্যতম জীবনীকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু এই কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করেননি। তাঁর মূল যুক্তি হল, এই সময় তিনি দেশে ছিলেন না। তার সপক্ষে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রামমোহন ১৮০৪ হতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ডিগবির অধীনে দূরবর্তী অঞ্চলে নানা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে রামগড়ে (হাজারিবাগ জেলায়), তারপরে যশোহরে এবং ভাগলপুরে এবং পরে রংপুরে তিনি ডিগবির সঙ্গে থাকতেন। ডিগবি ১৮০৯ হতে ১৮১৪ পর্যন্ত রংপুরের কালেকটার ছিলেন। রামমোহন তাঁর অধীনে সেখানেই কাজ করতেন। সুতরাং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যুর সময় যদি সতীদাহ হয়ে থাকে, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

সে যাই হোক, এই সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলন প্রসঙ্গেই রামমোহনের নারীজাতির প্রতি সহানুভূতির পরিচায়ক লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। সহমরণ সম্বন্ধে তিনি প্রথম পুস্তিকা রচনা করেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। পুস্তিকাটির নাম 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ'। এটি সহমরণের সপক্ষে ও বিপক্ষে সহানুভূতিশীল দুই ব্যক্তির অলোচনারূপে প্রকাশিত হয়। এর

বিপক্ষে কাশীনাথ তর্কবাগীশ একটি প্রতিবাদমূলক পুস্তিকা প্রচার করেন। সুতরাং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তার প্রত্যুত্তরে রামমোহন 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' লিখতে বাধ্য হন। তাতেই নারীজাতির প্রতি পুরুষ-পরিচালিত সমাজের নিগ্রহের কাহিনী করুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন ঃ বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গিনী বলে স্বীকার করা হয়; কিন্তু বিবাহিত জীবনে তাকে পশুরও অধম বলে গণ্য করা হয়। বাড়ীতে তাকে দাসীর মত খাটানো হয়। তার কাজ হল বাসন মাজা, ঘর মোছা, দুবেলা রান্না করা। রান্নায় কোনও ত্রুটি হলে স্বামী ও শাশুড়ী তাকে গালিগালাজ করে। খাওয়া হয়ে গেলে যা উচ্ছিষ্ট বা অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে তাকে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়। স্বামীর অর্থবল থাকলে স্ত্রীর চোখের সামনে সে রক্ষিতা পোষণ করে···। যেখানে স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকে, সেখানে তার সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হয়। এই ধরণের ঘটনা তো নিত্য ঘটে। কিন্তু রামমোহনের পক্ষে চোখের জল রোধ করা অসম্ভব হয় যখন তিনি দেখেন যে. নারীর উপর এত অত্যাচারের পরেও, কারও তার প্রতি এমন অনুকম্পা ফুটে ওঠে না যে, হাত-পা বেঁধে যখন তাকে পতির চিতায় ফেলে পুড়িয়ে মারা হয়, তখন বাধা দেবার প্রয়োজন বোধ করে।

উপরের উক্তিগুলি দুই দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ তা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নারীজাতির অবস্থা পুরুষের স্বার্থে কতখানি শোচনীয় হয়েছিল, তার একটি উজ্জ্বল চিত্র আমাদের চোখের সামনে স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত তা দেখায় তাঁর হৃদয় কতখানি সংবেদনশীল ছিল এবং সেই কারণে নারীজাতির সামাজিক উন্নয়নের কতখানি প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন।

একই কারণে নারীজাতির অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছিলেন। এ বিষয় জনমত গঠন করবার জন্য তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে একটি পুস্তিকা ইংরাজীতে রচনা

করে প্রকাশ করেন। তার বিষয় হল হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর যে অধিকার প্রাচীনকালে স্বীকৃত হয়েছিল তার উপর অনধিকার প্রবেশ। সেখানে তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসারে বিধবা পত্নী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পুত্রের সমান অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে পাবার অধিকারী; কিন্তু পরবর্তী কালে সে অধিকার হতে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে।*

(৩)

সুতরাং তাঁর বৌদির সতী হওয়ার দুর্ভাগ্য তাঁর ভাগ্যে ঘটে থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি যে সতীদাহের মত বীভৎস রীতি তুলে দিতে উদ্যোগী হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাই দেখি ধর্মই তাঁর জীবনের মূল আকর্ষণ হওয়া সত্বেও তিনি সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য তুমুল আন্দোলন করেন। উপরের উল্লিখিত 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' নামে যে দুটি পুস্তিকা তিনি রচনা করেন, সে দুটি সেই আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব।

হিন্দুসমাজে মানুষের মনে সতীদাহ-প্রথা ভাগ্যহীনা সতীর প্রতি কোনও সহানুভূতিশীলতা ফুটিয়ে তুলতে না পারলেও, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শাসনভার প্রাপ্ত হওয়ার পর, ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের কাছে তা অত্যন্ত বর্বর ও বীভৎস মনে হয়েছিল। তার কারণ সুস্পষ্ট। হিন্দুর বিবেক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ইংরেজের মন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত ছিল। তাই দেখি ইংরেজ শাসন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ শাসক ঐ প্রথার বিরোধিতা করেছে।

দক্ষিণ ভারতের ত্রিপেট্টিতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ক্যাপটেন টমিন নামে এক রাজপুরুষ এক সতীকে উদ্ধার করে আনেন বলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সাহাবাদে এক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট সতীদাহের অনুমতি দেন এবং সপরিষদ গর্ভণর জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিস-

* পুস্তিকাটির নাম হল Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Anciert Rights of Females according to the Hindu Law of Inheritance.

এর কাছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ 'হিন্দুদের সংস্কার এবং প্রচলিত রীতি যথাসম্ভব সহ্য করতে হবে স্বীকার করি; কিন্তু যে প্রথা মানুষের স্বভাবের বিরোধী আমি তার অনুমতি আমার শাসনাধীন স্থানে দিতে পারি না। উত্তরে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাধা না দিতে পরামর্শ দেন।

তারপর দেখি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে জে, আর, এলফিনস্টোন নামে বিহার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট একটি বারো বৎসরের বালিকার সহমরণ নিষেধ করেন। এ বিষয় কোন সরকারী নির্দ্দেশ না থাকায়, তিনি সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ চেয়ে পাঠান। তখন তদানীন্তন গভর্নর জেনারল লর্ড ওয়েলেসলি নিজামত আদালতের নিকট এ বিষয় উপদেশ চেয়ে পাঠান। তাঁরা এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত পরামর্শ করে কতকগুলি নির্দেশের খসড়া পাঠান। কিন্তু এ বিষয় কিছুই করা হয়নি।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের ম্যাজিষ্ট্রেট সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে কোনও নির্দেশ না থাকায় নিজামত আদালতের নিকট নির্দেশ চেয়ে পাঠান। তখন লর্ড হেস্টিংস গর্ভনর জেনারল। তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে একটি নির্দেশ প্রচার করেন। তার মর্ম হল, হিন্দুরীতি অনুসারে যেখানে তার অনুমোদন নেই সেখানে তা রহিত করা; যেমন যে ক্ষেত্রে বিধবা সতী হতে অনিচ্ছুক, বয়সে ষোল বছরের নীচে বা অন্তঃসত্ত্বা বা তাকে মাদকদ্রব্য সেবন করান হয়েছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই নিষিদ্ধ তালিকায় আর একটি বিষয় যোগ করা হয়, যে বিধবার শিশু-সন্তান আছে তার প্রসঙ্গেও এই নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায়, সতীদাহের সংখ্যা বেশ বেশী হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় কলিকাতাতেই সতীদাহের সংখ্যা সব থেকে বেশী। ১৮১৫ হতে ১৮১৮ অবধি তালিকা এই রকম ছিল ঃ

খৃষ্টাব্দ	সতীদাহের সংখ্যা
১৮১৫	৩৭৮
১৮১৬	৪৪১
১৮১৭	৭০৭
১৮১৮	৮৩৯
	মোট ২,৩৬৫

এই তালিকা হতে দুটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, প্রথমত সরকারের সতীদাহ-প্রথা আংশিক দমনের চেষ্টা ফলবতী হয় নি। প্রতি বৎসরই, চেষ্টা সত্ত্বেও, সতীদাহের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। দ্বিতীয়ত, কলিকাতা অঞ্চলেই সতীদাহের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। চার বছরে মোট ২,৩৬৫ সতীদাহের ঘটনার মধ্যে একা কলিকাতাতেই ১,৫২৮টি ঘটে। কলিকাতার মানুষ কি আরও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল ?

এইচ. ওকলি নামে হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তার এক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণায় ১৮১৩ পর্যন্ত সতীদাহ-প্রথা সম্পর্কে সরকারের কোনও নির্দেশ ছিল না। পরে যে নির্দেশ প্রবর্তিত হল, সেই অনুসারে সরকারী কর্মচারী প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর ক্ষেত্র অনুসারে অনুমতি দেবার ফলে, মানুষের ধারণা হয়েছিল যে, শাসকজাতির সতীদাহ-প্রথায় অনুমোদন আছে। তা দেখায় যে, আধাআধি ব্যবস্থায় কোনও ফল হয় না। যা বিগর্হিত, যাকে নীতিবোধ সমর্থন করে না, তাকে কঠিন হস্তে দমন করতে হয়।

কিন্তু কঠিন হস্তে দমন করার সাহস বিদেশী প্রশাসক-মণ্ডলীর তখন ছিল না। তারা এসেছিল বিদেশ হতে বাণিজ্য করতে। ভাগ্যের আকস্মিক আনুকূল্যে তারা হয়ে বসেছে এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রশাসক। যাদের শাসন করবে তারা ভিন্ন জাতি, তাদের ধর্ম ভিন্ন, জীবনধারণ-প্রথা ভিন্ন। ইংরেজের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, যতদিন নির্ঝঞ্ঝাটে শাসন করা যায় তার চেষ্টা করলে। সামাজিক রীতি বা ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে তাই তারা ভয় পেত। ফলে যদি অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, আর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, তাদের সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

কাজেই দেশের মানুষদের মধ্যে যাদের বিবেক ক্রিয়াশীল তাদের এগিয়ে আসতে হয়। রামমোহনের জীবনীকার শ্রীমতী সোফিয়া ডবসন কোলেট-এর বিবরণ অনুসারে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারল-এর কাছে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দুটি আবেদন-পত্র পেশ করা হয়। দ্বিতীয় আবেদন-পত্রটি তিনি দেখেছেন। তাতে কলিকাতার অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল।

তার প্রতিবাদে রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধির পক্ষ হতে আর একটি আবেদন-পত্র স্থাপন করা হয়। তাতে সরকার সম্প্রতি সতীদাহ-প্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করতে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা রহিত করবার জন্য আবেদন করা হয়। তার প্রতিবাদে সরকারের নিকট আর একটি আবেদন-পত্র স্থাপন করা হয়। তাতে সতীদাহ-প্রথার বীভৎসতা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বিশ্বাসযোগ্য চাক্ষুষ প্রমাণের ভিত্তিতে আবেদনকারিগণ অবগত আছেন, অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটেছে যেখানে যাদের স্বার্থ বিধবার মৃত্যু ঘটানোর সহিত জড়িত এমন সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর প্ররোচনায় নারী স্বামীর চিতায় উঠতে বাধ্য হয়েছেন ; এমনও হয়েছে যেখানে শোকের প্রথম আঘাতে সহমরণে হঠকারিতার সহিত সম্মত হয়ে, পরে ভয়ে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছেন এমন নারীকে দড়ি দিয়ে বেঁধে চিতায় জোর করে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং যতক্ষণ না অগ্নিশিখায় দগ্ধ হয়েছে ততক্ষণ কাঁচা বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে রাখা হয়েছে ; এমন ঘটেছে যে চিতা হতে উঠে পালিয়ে গেলে আত্মীয়েরা তাকে ধরে তুলে এনে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। আপনার বিনীত আবেদনকারীদের ধারণায় এই সব দৃষ্টান্তগুলিই সকল শাস্ত্র অনুসারে এবং সকল জাতির সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে হত্যারই সমস্থানীয়।"

এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা আবেদন করেন সতীদাহ-প্রথা রহিত করতে সরকার যেন আরও নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এই আবেদন-পত্রখানি আগস্ট ১৮১৮ তারিখের দ্বারা চিহ্নিত। রামমোহন সম্ভবত এই দরখাস্তখানি রচনা করেন। তাতে রামমোহনের স্বহস্তের

লেখাও পাওয়া যায়। সুতরাং এইভাবে রামমোহন, সতীদাহ-প্রথা রহিত করবার সপক্ষে যে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এই প্রসঙ্গেই তিনি 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক সংবাদ' নামে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু তখনও লর্ড হেষ্টিংস ভারতের গভর্নর জেনারল। তিনি এ বিষয় কোনও নূতন নির্দেশ দেন নি। সম্ভবত তিনি যে নীতি পূর্বে গ্রহণ করেছিলেন তাই বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গভর্নর জেনারল-এর পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্থলে এই পদে যিনি নিযুক্ত হন তিনি হলেন লর্ড আমহার্স্ট।

ইতিমধ্যে সতীদাহের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তার সংখ্যা ছিল ৬৩৯। পূর্ব বৎসরের তুলনায় তা শতকরা দশভাগ বেশী। ফলে বিষয়টির প্রতি নিজামত আদালতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। বিচারক স্মিথ সতীদাহ-প্রথা রহিত করবার সুপারিশ করলেন। বিচারপতি রস তার সমর্থন জানালেন। বিষয়টি কাউনসিলে স্থাপিত হল। কাউনসিলের সহ-সভাপতি বেয়লি প্রস্তাব করলেন প্রথাটি এমন অঞ্চলে রহিত করা হক, যেখানে সরকারের রাজ্য সম্প্রতি বিস্তৃত হয়েছে এবং লর্ড হেষ্টিংস-এর নির্দেশ তখনও প্রবর্তিত হয় নি, যেমন দিল্লী, নর্মদা ও কুমায়ুন অঞ্চল। এ প্রস্তাবটির তারিখ হল ১৩ জানুআরি ১৮২৭। সহ সভাপতি কোম্বারমেয়ার বেয়লির প্রস্তাব গ্রহণ করতে সুপারিশ করলেন।

লর্ড আমহার্স্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। প্রথমত তাঁর ধারণায় আংশিক প্রতিষেধক ব্যবস্থা কার্যকর হয় না। অপরপক্ষে প্রথাটি সম্পূর্ণ বিলোপ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর ধারণায় জ্ঞান বিস্তারের ফলে ধীরে ধীরে এই প্রথার আপনি বিলোপ ঘটবে। তাঁর মনোভাব ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁর নির্দেশ হতে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তার প্রাসঙ্গিক অংশের বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হল ঃ

'সতীদাহ-প্রথাকে নিষিদ্ধ করে কোনও প্রস্তাব দিতে আমি

প্রস্তুত নই। এই কুপ্রথার প্রতি আমি উদাসীন এমন ধারণা উৎপাদিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও আমি স্পষ্টই স্বীকার করি যে, আমার ইচ্ছা এই সুপারিশ করা যে এদেশের মানুষের মধ্যে যে জ্ঞানের বিস্তার ঘটছে তার ওপর নির্ভর করা হক, এই আশায় যে এই জঘন্য কুসংস্কার ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে।"

কিন্তু নিজামত আদালতের বিচারকগণ ছাড়বার পাত্র নন। বিচারক বেয়লি আবার সতীদাহ-প্রথা রহিত করবার সুপারিশ করে পাঠালেন। লর্ড আমহার্স্ট-এর প্রতিক্রিয়ায় কোনও পরিবর্তন ঘটল না। তিনি আবার দেশের মানুষের মনে সুবুদ্ধির উদয়ের ওপর নির্ভর করে বিষয়টি চাপা দিলেন। তারিখটা ছিল জানুআরি ১৮২৮। তার দুমাস পরেই তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলেন।

তাঁর জায়গায় যিনি নূতন গভর্নর জেনারল নিযুক্ত হয়ে এলেন, তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রশাসকদের অন্যতম লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিংক। দেশের কল্যাণসাধন করতে তিনি যা ভাল বুঝতেন তার নির্দেশ দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এ বিষয় তিনি সত্যই দুঃসাহসী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষাপ্রসারকে সরকারের নীতি হিসাবে তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য রীতিতে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষণের জন্য তিনিই কলিকাতায় মেডিকাল কলেজ স্থাপন করেন। কাজেই এ হেন মানুষের হাতে সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেল।

ঠিক বলতে কি প্রায় পঁচিশ বছর ধরে সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে সরকারী নীতি কি হবে তা নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যেই একটা আন্দোলন চলে আসছিল। অন্য প্রশাসকরা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিল। কেবল হেষ্টিংসই এ বিষয় কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কারণও বোঝা যায়। বিদেশী সরকারের কোনও একটি প্রথা রহিত করতে দশবার ভাবতে হয়। তাঁদের ভাবতে হয় তাতে দেশীয় প্রজারা অসন্তুষ্ট হবে কিনা; ফলে সিপাহিরা বিদ্রোহী হবে কিনা ইত্যাদি। তাই প্রথাটি নীতিবিরুদ্ধ হলেও তাকে সোজাসুজি দমন করতে সাহস পেতেন না।

বেণ্টিংক এসে দেখেন সতীদাহ-প্রথা সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তিনি কাজের মানুষ, সাহসী মানুষ;

তিনি ত বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন না। বিষয়টি যে নীতিবিরুদ্ধ এবং সবল হস্তে দমন করার যোগ্য, সে বিষয় তাঁর দ্বিধা ছিল না। কতখানি ঝুঁকি নেওয়া যায়, তাই ছিল তাঁর বিবেচনার বিষয়।

তিনি জানতেন ব্রিটিশের সাম্রাজ্য ভারতীয় সিপাইদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রথম তিনি খবর নিলেন সতীদাহ-প্রথা রহিত হলে সিপাইদের মধ্যে কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হবে কিনা সেই বিষয়। গুপ্ত অনুসন্ধানের ফলে তিনি এই জেনে নিশ্চিন্ত হলেন যে, সিপাইদের ওপর তার কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না।

এদিকে নিজামত আদালতের বিচারকগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ জন বিচারকই এই প্রথা রহিত করবার জন্য আবার সুপারিশ করে পাঠালেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানালেন, এই প্রথা রহিত হলে সরকারের কোনও বিপদ ঘটবে না।

তখন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বেণ্টিংক রামমোহনকে পরামর্শ দেবার জন্য ডেকে পাঠালেন। এ বিষয় রামমোহন যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে বিষয় বেণ্টিংক একটি লিখিত বিবরণ রেখে গেছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"তাঁর (রামমোহনের) মতে এই প্রথা, তার বিরুদ্ধে নানা বাধা স্থাপন করে এবং পুলিশের পরোক্ষ সাহায্য নিয়ে অলক্ষ্যে এবং নিঃশব্দে দমন করা যায়। তাঁর আশঙ্কা এ বিষয় কোন বিধি প্রয়োগ করলে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে।"

রামমোহনের উপদেশ হতে বেণ্টিংক যা বুঝেছিলেন তাও তিনি লিখেছেন। তাঁর ধারণায়, রামমোহনের উপদেশের তাৎপর্য হল ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করার পর যদি আইন করে এই প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়, তা হলে ভারতীয় হিন্দুর আশঙ্কা হবে যে, মুসলমান রাজাদের অনুসরণে এরপর ইংরেজ তাদের ধর্ম হিন্দুর উপর চাপিয়ে দেবে।

রামমোহনের এই আচরণ ব্যাখ্যা করা শক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, তা তাঁর পূর্বের এবং পরবর্তী আচরণের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ-প্রথা নিরোধের সপক্ষে

আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সে বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি যে সতীদাহ-প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করায় তৃপ্তি লাভ করেছিলেন সে বিষয়েও প্রমাণ পাওয়া যায়। তার কিছু প্রমাণ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে।

বেণ্টিংক ৪ ডিসেম্বর ১৮২৯ তারিখে একটি রেগুলেশন পাশ করে যখন সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলেন, তখন সমাজের রক্ষণশীল অংশ এই আইন প্রতিরোধ করতে আন্দোলন শুরু করল। জানুয়ারী ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাবাসীর পক্ষে ৮০০ মানুষের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে গভর্নর জেনারল-এর কাছে এই নূতন নির্দেশ তুলে দেবার অনুরোধ করে একটি আবেদন-পত্র পাঠানো হয়। তার সমর্থনে ১২০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত একটি অভিমত স্থাপিত হল, যা বলল সতীদাহ-প্রথা হিন্দুধর্মের অঙ্গ। মফঃস্বলের পক্ষ হতেও ৩৮৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি-স্বাক্ষরিত একটি অনুরূপ প্রতিবাদ-পত্র স্থাপিত হল।

ওদিকে সরকারের নির্দেশের সমর্থনেও একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে দুটি পৃথক্ আবেদন-পত্র স্থাপিত হল। দ্বিতীয় আবেদন-পত্র রামমোহন স্বাক্ষরিত এবং সম্ভবত তাঁরই রচিত। তা রক্ষণপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করে সরকারের নূতন নির্দেশের জন্য 'গভীর কৃতজ্ঞতা' এবং চূড়ান্ত শ্রদ্ধা' নিবেদন করেছিল। (Government Gazette, Vol XVI No. 858 dt. 18.1.1830 দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয়ত দেখি, ১৬।১।১৮৩০ তারিখের একটি অভিনন্দন বেণ্টিংককে সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। তা ইংরাজীতে রচিত ও বাংলায় অনূদিত ছিল। তাতে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতির স্বাক্ষর ছিল। তার মর্ম হল সতীদাহ-প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নয়, তা কতকগুলি স্বার্থান্ধ মানুষের প্ররোচনায় গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, তা রহিত করার জন্য লর্ড বেণ্টিংক-এর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তা অতিরিক্তভাবে সেকালের বাংলাভাষার কিছু নমুনা আমাদের নিকট স্থাপন করবে ঃ

"অধীনেরা এই নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থনার দ্বারা সমাপ্তি

করিতেছে যে এ অধমদের সর্বান্তঃকরণের সহিত শ্রীল শ্রীযুতের মহোপকারের অঙ্গীকার রূপ উপহার··কৃপাপূর্বক গ্রাহ্য করেন।”

সুতরাং রামমোহনের উপদেশ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে না। সম্ভবত তার এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে; এখানে তিনি ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিকোণ হতেই বিচার করে তার স্বার্থের অনুকূলে যে উপদেশ দেওয়া উচিত তা দিয়েছিলেন।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, বেণ্টিংক ঝুঁকি নিয়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে সতীদাহ-প্রথা রহিত করেছিলেন। তাঁর এই দুঃসাহস তাঁর বিচক্ষণতারও পরিচয় দেয়। তাঁর মানবিকতা-বোধ এই বর্বর রীতিকে সহ্য করতে পারে নি। অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিবেচনা করাও তাঁর কর্তব্য ছিল। সে কর্তব্য তিনি অবহেলা করেন নি। সিপাইদের উপর তার প্রতিক্রিয়া হবে না, তিনি জেনেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি জেনেছিলেন যে হিন্দুশাস্ত্রের সমর্থন সতীদাহ-প্রথার পিছনে নেই। তাই তিনি এই দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেন নি।

তাঁর মন যে এইভাবেই কাজ করেছিল, তার সপক্ষে এই নির্দেশের সমর্থনে যে যুক্তি প্রযুক্ত হয়েছিল, তা হতে বোঝা যায়। তাতে এই প্রথা রহিত করবার অনুকূলে দুটি যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। প্রথম, এই প্রথা মানবধর্মের বিরোধী, তা অত্যন্ত অমানুষিকভাবে নিষ্ঠুর। দ্বিতীয়, হিন্দুধর্মশাস্ত্রে কোথাও তার সমর্থন নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

নারীমুক্তি আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা

(১)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌরুষ রবীন্দ্রনাথকে সব থেকে বেশী মুগ্ধ করেছিল। তিনি বিদেশী শাসকজাতির নিকট কোনও দিন মাথা নত করেন নি। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কবি

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে 'বীরসিংহের সিংহশিশু' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপরাজেয় পৌরুষ অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার মনে হয় তার থেকেও সার্থক গুণ তাঁর ছিল, যা তাঁকে বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে অন্যতম মূখ্য ভূমিকা গ্রহণে প্রেরণা দিয়েছিল। তা হল তাঁর দয়া বা মমতাবোধ। সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে ভুল করে নি। তাঁর অধ্যাপকবৃন্দ তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিদ্বারা ভূষিত করেছিলেন; কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁর নাম দিয়েছিল 'দয়ার সাগর'। তাঁর করুণা, তাঁর মমত্ববোধই তাঁকে সেই প্রচণ্ড শক্তি দিয়েছিল, যা একক প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সেবায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সব থেকে ব্যাপক আন্দোলন ছিল ধর্মসম্পর্কিত আন্দোলন। তিনি তার ধারে কাছেও যান নি। মানবসেবাকেই তাঁর মুখ্য ব্রত বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের মানুষের সেবা করতে চেয়েছিলেন দুই ভাবে। প্রথম, সাধারণভাবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তিনি এমন একটি আদর্শ শিক্ষণরীতি প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন যাতে প্রকৃত শিক্ষার পথ প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়ত, তিনি নারীর উন্নয়ন আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা নিয়ে নারীজাতির উন্নতিসাধন করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে সমাজ দুটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে, একটি পুরুষজাতি ও অপরটি নারীজাতি। পুরুষের প্রবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার চাপে যুগ যুগ ধরে নারীকে পঙ্গু করে রাখার যে বিধি-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা নারীজাতিকে একান্তই অধঃপতিত করেছিল। তাদের উন্নতি না হলে সমাজ পঙ্গুই থেকে যায়। তাই তিনি এ বিষয় ব্রতী হয়েছিলেন। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণবোধ ও নারীজাতির দুর্দশায় অনুকম্পাবোধ—উভয়ই এখানে ক্রিয়াশীল ছিল।

আমাদের বর্তমান আলোচনার বিশেষ বিষয় দ্বিতীয়টি হলেও প্রথমটি অর্থাৎ শিক্ষারীতি-সংস্কারও তার সঙ্গে জড়িত। তাই প্রথমটির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেই আলোচনা প্রথমে সেরে নেবার প্রস্তাব করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণায় শিক্ষার দুটি দিক আছে। প্রথম, জ্ঞান অর্জন এবং দ্বিতীয়, নিজের চিন্তাকে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা। তাঁর আরও ধারণা ছিল, বাঙালীর পক্ষে মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করাই প্রশস্ত। তা ব'লে তিনি ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ব'লে নিজেও ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর ধারণায় ইংরাজী ভাষা শিখতে হবে যাতে পাশ্চাত্য জাতির অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা আমাদের নিকট উন্মুক্ত হয়। আর বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন শিক্ষার্থীর মনের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাকে পরিবর্ধিত করবার জন্য। তাঁর শিক্ষানীতি এই সূক্ষ্ম উপলব্ধি হতে গড়ে উঠেছিল।

সেকালে শিক্ষার্থী যুবকের দুটি পথ খোলা ছিল। এক, হিন্দুকলেজে ভর্তি হয়ে ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করা এবং তার সাহায্যে পাশ্চাত্য জাতির অর্জিত জ্ঞানের সহিত পরিচিত হওয়া। দ্বিতীয় পথ হল সংস্কৃত কলেজে পড়ে, সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তিলাভ করে পণ্ডিত হওয়া। তখন এই দুটি প্রতিষ্ঠানই ছিল উচ্চশিক্ষার মূল বাহন। প্রথমটি দেশের সমাজের প্রগতিশীল নেতারা স্থাপন করেন এবং দ্বিতীয়টি সরকার স্থাপন করেন। কিন্তু এই দুটি রীতির কোনটির দ্বারাই এককভাবে পরিপূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা হয় না। যিনি ইংরাজী শিক্ষার পথ নির্বাচন করবেন, তাঁর পাশ্চাত্যবিদ্যা নাগালের মধ্যে আসবে এবং ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি হবে; কিন্তু মাতৃভাষায় নিজের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অর্জিত হবে না। অপরপক্ষে যিনি সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা করবেন পশ্চিমের বিদ্যা তাঁর নাগালের বাহিরে রয়ে যাবে। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী কালে রামমোহনের সময় শিক্ষানীতি নিয়ে যে তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার কথা আর একবার স্মরণ করতে পারি। রক্ষণপন্থীরা চেয়েছিলেন সংস্কৃত শিক্ষাই প্রচলিত থাকুক। রামমোহনের নেতৃত্বে প্রগতিশীলরা চেয়েছিলেন ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হক। বিদ্যাসাগর এই দুই বিরোধী রীতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা সার্থক

হয়েছিল ; কারণ তিনি এই বিরোধের সমন্বয় করতে পেরেছিলেন মনে হয়।

একই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যা তাঁকে পীড়িত করেছিল। সে যুগে বাংলা গদ্য লেখ্য ভাষা গড়ে ওঠে নি। বাংলা কাব্যসাহিত্য প্রাচীন কাল হতেই সমৃদ্ধ, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্য বলে কিছু ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাংলা গদ্যরচনায় উৎসাহ দেওয়া হয় দুই তরফ হতে। যে সমস্ত ব্রিটিশ কর্মচারী এদেশে শাসনকার্যে নিয়োগের জন্য আসতেন তাঁদের বাংলা ভাষা শিখতে হত। তাই সরকার মৃতুঞ্জয় তর্কালঙ্কারকে দিয়ে একাধিক বাংলা পুস্তক রচনা করান। একই সময় মিশনারীদের ব্যবহারের জন্য কেরি সাহেবের উৎসাহ পেয়ে রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত' রচনা করেন। তারপর রামমোহন বাংলা ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লেখেন। এঁরাই ছিলেন এ বিষয় পথিকৃৎ ; কিন্তু তখনও বাংলা গদ্যসাহিত্য ভালভাবে গড়ে ওঠে নি।

এই পরিবেশে বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছিল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলা গদ্য রচনার শক্তিসঞ্চয়ের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, সংস্কৃত সাহিত্য অতি সমৃদ্ধ এবং তার শব্দভাণ্ডার বিপুল। প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে পুষ্ট করা যেতে পারে। কিন্তু এখানেও তিনি বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ, সংস্কৃতে অধিকার অর্জন দুঃসাধ্য, ব্যাকরণকে আয়ত্ত না করলে তা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে ব্যাকরণ-শিক্ষণরীতি ছিল একান্ত নীরস। সেই কারণে তিনি সুসংবদ্ধভাবে সাজানো বাংলায় লিখিত একটি ব্যাকরণ রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। এর থেকেই 'ব্যাকরণকৌমুদী'র জন্ম।

শুধু তাই নয়, বাংলা গদ্যসাহিত্যকে শক্তিশালী করবার জন্য এবং একটি উচ্চমানের গদ্যসাহিত্যের সহিত শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানোর জন্য তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্য রচনারও ভার গ্রহণ করেছিলেন। একেবারে শিশু হতে শুরু করে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বিভিন্ন স্তরের জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'কথামালা',

'চরিতাবলী', 'শকুন্তলা উপাখ্যান' ও 'সীতার বনবাস' উল্লেখযোগ্য।

আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তাঁর একটি নিজস্ব মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি পাই তাঁর ইংরাজীতে লেখা এক চিঠির মধ্যে। একটি বিতর্ক প্রসঙ্গেই এই চিঠিখানি লিখিত হয়। মোয়াট সাহেব তখন 'এডুকেশন কমিটি'র সম্পাদক এবং বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। এই সময় বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যাল্যানটাইন সাহেবের ওপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়। পরিদর্শনের পর পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর তাদের কতকগুলি গ্রহণ করতে অসম্মত হন। এই প্রসঙ্গেই মোয়াট সাহেবের সহিত তাঁর পত্র বিনিময় শুরু হয়। সেই সময় মোয়াট সাহেবকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত চিন্তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশের বাংলা অনুবাদ এই ঃ

"আমি যদি শিক্ষার্থীদের প্রথমে বাংলা ভাষায় উপযুক্ত অধিকার স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত শিক্ষা দিই এবং তারপর ইংরাজীর সাহায্যে তাদের মনে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চারিত করি এবং এই কাজে যদি 'এডুকেশন কমিটি' হতে প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং উৎসাহ পাই, তা হলে আপনাকে কথা দিচ্ছি যে কয়েক বছরের মধ্যেই আমি এমন একদল ছাত্র গড়ে তুলব যারা শিখবার এবং শিক্ষা দেবার ক্ষমতার গুণে, যে ছাত্রগণ আপনার স্বদেশের এবং ভারতের কলেজে পারদর্শিতা দেখিয়েছে, তাদের থেকে অধিক-তর যোগ্যতার সহিত দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে সাহায্য করবে।" (মোয়াটকে লিখিত ৫।১০।৫৮ তারিখের চিঠি)।

মনে হয় এই মণীষীর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। সংস্কৃত শিক্ষার পথ সহজ হওয়ায় এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর স্থাপিত উচ্চতর বাংলা গদ্যরচনা-রীতির সহিত পরিচিত হওয়ায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় যে পথে বিদ্যাসাগর দেশের উন্নতি সাধন করতে

চেয়েছিলেন তা হল নারী-উন্নয়ন আন্দোলন। আগেই বলা হয়েছে এর প্রেরণা তাঁর নিজস্ব করুণাবোধ। পুরুষ পরিচালিত সমাজে নারীজাতির প্রতি নির্লজ্জ অবিচারের ফলে তাদের দুর্দশা চোখে দেখে, তাঁর হৃদয় অনুকম্পায় ভরে গিয়েছিল। তা-ই তাঁকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়েছিল নারীজাতির উন্নয়ন আন্দোলনে সব থেকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হতে। এ বিষয় তাঁর মনে কতখানি ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল, তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর 'বিধবা বিবাহ' শীর্ষক পুস্তিকার ভূমিকা হতে। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ

"অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া রহিয়াছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। * * * হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্ বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"

এই বিষয়টিই বর্তমান আলোচনার বিশেষ বিষয়। এখন তার মধ্যে প্রবেশ করা যেতে পারে।

(২)

এই আলোচনা বিদ্যাসাগরের আর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আরম্ভ করা যেতে পারে। তা দেখাবে নারীজাতির প্রতি অবিচার তাঁর মনকে কতখানি পীড়া দিয়েছিল। সেটি তাঁর 'বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। তিনি বলেছেন ঃ

"স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত অপদস্ত হইয়া কালহরণ

করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্বপ্রদেশেই সদৃশী অবস্থা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে, পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।"

এই অবিচার বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়ে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তাই একক চেষ্টায় তিনি নারীজাতির উন্নয়ন আন্দোলনে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে নেমে পড়েছিলেন। এই আন্দোলনের জন্য তাঁর নিজস্ব একটি পরিকল্পনা ছিল। তিনি বুঝেছিলেন নারীজাতির দুর্দশার কারণ পুরুষজাতির স্বার্থপরতা এবং নারীজাতির দুর্বলতা। দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে সম্ভব করেছিল। তাই তিনি ঠিক করলেন, নারীজাতিকে শিক্ষিত করে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবেন। এই ভাবেই সমস্যাটির মূলে কুঠারাঘাত সম্ভব। তারপর দ্বিতীয় দফায় তিনি চাইলেন নারীদের যে সব অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে সেই অধিকার জয় করে দেবেন। সুতরাং এই আন্দোলনের দুটি শাখা। একটি নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়, তাদের বিধবাবিবাহে অধিকার স্থাপনের ব্যবস্থা ও পুরুষের বহু-বিবাহ-প্রথা রহিত করার ব্যবস্থা। আমরা প্রথমে নারী-শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা আলোচনা করব।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে যে নারীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নি, তা নয়। তা হয়েছিল দুই তরফ হতে। ক্রিশ্চান মিশনারীদের পক্ষ হতে যেমন হয়েছিল, তেমন হিন্দুসমাজের পক্ষ হতে হয়েছিল। আমরা দেখি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মিশনারীদের উদ্যোগে The Female Juvenile Society স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য করা। Female Society for Native Female Education কলিকাতায় মেয়েদের জন্য ৮টি বিদ্যালয় স্থাপন করে। রাজা রাধাকান্ত দেবের তত্ত্বাবধানে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এই সকল চেষ্টা দানা বাঁধে নি, কারণ

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে একটি প্রবল কুসংস্কার ছিল।

স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সার্থক চেষ্টা বাংলা দেশে ঘটে জে ই ডি বীটন ও বিদ্যাসাগরের যৌথ উদ্যোগে। বীটন তখন ছিলেন ভারত সরকারের কাউনসিল-এর আইন বিষয়ক সভ্য (Law Member)। তিনি সরকারের এডুকেশন কমিটিরও সভাপতি ছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে হেদোর ধারে (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) নেটিভ ফিমেল স্কুল নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বীটন হন পরিচালক সমিতির সভাপতি এবং বিদ্যাসাগর সম্পাদক। পরে বীটন-এর অকাল মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে তার নাম রাখা হয় Bethune School। তা-ই বাংলা উচ্চারণে বিকৃত হয়ে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের কর্মকুশলতা বিদ্যালয়টিকে শীঘ্রই উন্নতির পথে এগিয়ে দেয়। মেয়েদের স্কুলে আনবার জন্য যে ঘোড়ায় টানা গাড়ীর ব্যবস্থা হয় বিদ্যাসাগর তার গায়ে মনুর এই নির্দেশটি লিখে দেন ঃ 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'। উদ্দেশ্য, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া মেয়েদেরও সযত্নে শিক্ষা দেবার নির্দেশ প্রাচীন শাস্ত্রে ছিল।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিক হ্যালিডে বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট শিক্ষানবীশ অবস্থায় শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তাঁর চরিত্রগুণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণবাংলার বিদ্যালয়-পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। তখন কেউ জানত না, এই সূত্রেই পরে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যে তিনি সরকারী পদে ইস্তফা দেবার সংকল্প গ্রহণ করবেন। সে কাহিনী যথাসময় আসবে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন কাজের মানুষ। তিনি সরকারী রীতিতে মন্থর গতিতে কাজ করতে পছন্দ করতেন না। তাই সরকারের অনুদানের অপেক্ষায় না থেকে তিনি ১৮৫৭-এর নভেম্বর হতে ১৮৫৮-এর মে-র মধ্যে দক্ষিণবাংলায় বিভিন্ন জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়

স্থাপন করেন। সেগুলি এই ভাবে ছড়ান ছিল ঃ

হুগলী জেলা—২০, বর্ধমান জেলা—১১, মেদিনীপুর জেলা ৩, নদীয়া জেলা—১।

তাদের পরিচালনার ব্যয় বাবদ তিনি নিজ তহবিল হতে ৩,৪৩৯৲ টাকা ব্যয় করেন। যখন তিনি এই টাকা সরকারের কাছে ফিরে চান, তখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক লেগে যায়। এটি প্রকৃতপক্ষে এক কর্মতৎপর মানুষের সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের দ্বন্দ্ব আর কি!

বিতর্কটি সংঘটিত হয় এইভাবে। উড সাহেবের প্রস্তাবমত সরকারের শিক্ষাবিভাগের বিন্যাসের পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আগে এডুকেশন কমিটি শিক্ষাব্যবস্থা দেখতেন। এখন উচ্চশিক্ষার জন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং শিক্ষাবিভাগের পক্ষ হতে শিক্ষাব্যবস্থার তত্ত্বাবধানের জন্য 'ডিরেকটার অফ পাবলিক ইনসট্রাকশন' পদটি সৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য এডুকেশন কমিটি উঠে যায়।

যিনি নূতন ডিরেকটার হয়ে আসেন তাঁর নাম ডব্লিউ গর্ডন ইয়ং। তিনি আমলাতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে বিদ্যাসাগরের তড়িৎগতিতে নব নব বিদ্যালয় স্থাপনে আপত্তি জানান। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটি তিক্ততার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের জন্য যে অগ্রিম টাকা দিয়েছিলেন তা যখন ফেরত চান, তা মঞ্জুর করতে ইয়ং অস্বীকার করেন। বিদ্যাসাগরও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেকটারদের নিকট আবেদন করেন। তাঁরা যে টাকা বিদ্যাসাগর খরচ করেছিলেন তা ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন; কিন্তু ভবিষ্যতের অনুদান বন্ধ করে দেন। এই দ্বিতীয় নির্দেশের পিছনে শাসকজাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা ছাড়া আর কোনও যুক্তি ছিল বলে মনে হয় না।

এর ফলে বিদ্যাসাগর সরকারী কর্মচারী হিসাবে দেশসেবায় আর উৎসাহ পেলেন না। তিনি ঠিক করলেন অধ্যক্ষ তথা পরিদর্শকের পদে ইস্তফা দেবেন। দিলেনও। পদত্যাগের কারণ হিসাবে তিনি দুটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। সেই কারণ দুটি

তাঁর গর্ডন ইয়ংকে লিখিত ৫ই আগস্ট ১৮৫৮ তারিখের চিঠিতে উল্লিখিত আছে। প্রথম উল্লেখ করলেন, সরকারী কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। দ্বিতীয় কারণটি নিয়ে এক তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তার প্রাসঙ্গিক অংশের একটি অনুবাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই ঃ

"আরও যে সব ছোট কারণ আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে তাদের মধ্যে আছে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার অভাব এবং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সহানুভূতির অভাব যা এই বিভাগের প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন কর্মচারীর থাকা উচিত।"

স্পষ্টই বোঝা যায় শেষের কারণটি গর্ডন ইয়ং-এর আচরণ এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপ স্থাপিত হয়েছে। উপর মহলে তার প্রতিক্রিয়া হল মিশ্র ধরনের। গর্ডন ইয়ং পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করতে সম্মত হলেন, কিন্তু চাইলেন 'ছোট কারণ' হিসাবে পত্রে যা লিখিত হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হলেন না; কারণ, তাঁর মতে এখানে একটি নীতির প্রশ্ন এসে পড়ে। যা সত্য তাঁর মতে তা প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই তিনি জানালেন, সে অংশটি তিনি প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

তখন পত্রখানি লেফটেনান্ট গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের নিকট স্থাপিত হল। তিনি উভয় সংকটে পড়লেন। একদিকে বিদ্যাসাগরকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, অপর দিকে শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ এখানে জড়িত। তিনি নিজে শাসক; সুতরাং সেই দিকেই তাঁর মন ঝুঁকল। তিনি বিদ্যাসাগরকে অংশটি বাদ দিতে অনুরোধ করলেন। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে পত্রবিনিময় চলল। কিন্তু লেঃ গভর্নরের চাপও তাঁকে, যা তিনি ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচনা করেছিলেন তা হতে, নিবৃত্ত করতে পারল না। তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ভদ্রভাবে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। 'বীরসিংহের সিংহশিশু' সরকারের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধির নিকট নতিস্বীকার করলেন না।

পত্রখানি দুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, তা তাঁর অজেয় পৌরুষের পরিচয় দেয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর স্বভাবসুলভ ভদ্রতারও

পরিচয় এতে পাওয়া যায়। অতি ভদ্রভাষায় তিনি এই প্রত্যাখ্যান পত্র রচনা করেছিলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে অনুবাদে উদ্ধৃত করা হল। চিঠিখানির তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮। তিনি প্রথমে লিখছেন ঃ

"পরিণত চিন্তার পর আমি দেখছি সঙ্গতি বা শিষ্টাচার রক্ষা করে পদত্যাগ পত্রটির যে অংশ আপনার নিকট আপত্তিকর মনে হয়েছে তা তুলে নিতে পারি না। এ কথা সত্য যে স্বাস্থ্যহানি আমাকে পদত্যাগে প্রণোদিত করবার অন্যতম মূল কারণ। কিন্তু আমি বিবেকের অনুমোদন নিয়ে বলতে পারি না যে তাই একমাত্র কারণ। তা যদি হত তা হলে আমি দীর্ঘ ছুটির দরখাস্ত করে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে নিতে পারতাম।"

পত্রটি শেষ করেছেন এই ভাবে ঃ

"পত্রের আপত্তিকর অংশ সম্ভবত আপনাকে কিছু অসুবিধায় ফেলতে পারে জেনে আমি যে গভীর অনুশোচনা বোধ করছি তার তুলনা হয় না; অপরপক্ষে আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনাকে যে সামান্যতম অসুবিধা ও ঝঞ্ঝাটে ফেলেছি তা ভাবতে যে পরিমাণ অস্বস্তি বোধ করি তা প্রকাশের ভাষা নাই।"

নারীশিক্ষায় প্রগতি দেখে তিনি যে কত আনন্দিত হতেন তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের একটি ঘটনা হতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয়, তখন মহিলাদের জন্য তার দরজা খোলা রাখা ছিল না। নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে এবং জনমতের চাপে ২৭ এপ্রিল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে গৃহীত সিনেটের একটি প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষার দ্বার মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত হয়। কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী বসু নামে দুই ভগিনী এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর চন্দ্রমুখী বসু এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহিলাদের মধ্যে প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হন।

এটি নিশ্চিত নারী-উন্নয়নের সপক্ষে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাতে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তিনি ক্যাসল কোম্পানীর একখণ্ড সচিত্র শেকসপীয়ার গ্রন্থাবলী তাঁকে

উপহার দেন। তাতে তিনি স্বহস্তে যে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন তা তাঁর মনের অকৃত্রিম আবেগের সুন্দর পরিচয় দেয়। তার বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায় ঃ

শ্রীমতী কুমারী চন্দ্রমুখী বসুকে
যিনি প্রথম বাঙালী মহিলা হয়ে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
মাস্টার অফ আর্টস উপাধি অর্জন করেছেন।

তাঁর অকৃত্রিম শুভানুধ্যায়ী
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

(৩

পুরুষ পরিচালিত সমাজে পুরুষের বিপত্নীক হবার পর বিবাহের অধিকার স্বীকৃত, এমন কি বহু-বিবাহও স্বীকৃত; কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে তা একেবারে নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়, কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বৈধব্য ঘটলে অনেক নারীর ভাগ্যে সহমরণ ঘটত। সরকারের নির্দেশে সম্প্রতি হিন্দুসমাজ সে কলঙ্ক হতে মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এই অসাম্য বিদ্যাসাগরের ন্যায়বোধকে আঘাত করেছিল। আরও বড় কথা, তাঁর কোমল হৃদয়কে বিধবাদের ওপর যে নিগ্রহ পরিচালিত হত তা অত্যন্ত পীড়া দিত। সেই কারণে তিনি বিধবাদের পুনর্বিবাহে অধিকার স্থাপনের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর পরিপাটি মন এ বিষয় একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা করে নিয়ে আন্দোলনে নামতে চেয়েছিল। তার প্রয়োজনও ছিল। প্রথমত সমাজের রক্ষণশীল অংশের বাধা আছে। দ্বিতীয়ত পিতামাতা জীবিত; তাঁদের দিক হতেও আপত্তি ওঠবার সম্ভাবনা আছে। সে আপত্তি খণ্ডন করার প্রয়োজন আছে। তৃতীয়ত সরকারের এ বিষয় হস্তক্ষেপ সহজলভ্য করবার জন্য শাস্ত্রের অনুমোদনের প্রমাণ দরকার। তা না হলে মানবিকতার দিক হতে এই প্রবর্তনামূলক ব্যবস্থা বিদেশী সরকারের সহানুভূতি উদ্রেক করলেও সক্রিয় সহযোগিতা পাবে না। এই সব দিক বিবেচনা করেই তিনি ধীরে ধীরে একের পর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন।

প্রথমেই তাঁর ইচ্ছার অনুকূলে জনমত গঠন করবার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'বিধবা বিবাহ' নাম দিয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিপাদ্য বিষয় করে একটি পুস্তিকা লেখেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড)-এ লিখেছেন যে এই পুস্তিকাখানি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে কয়েকদিনের মধ্যে ১৫,০০০ কপি বিক্রয় হয়ে যায়। কাজেই সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারকার্যে তার ভূমিকা খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। আরও সৌভাগ্যের কথা, সেকালের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তা সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয় তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' যে কবিতাটি লিখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই ঃ

বিধবার বিয়ে হবে, এ ত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্মের ফল।
বিবাদি হয়েছে এবে যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল।

রচনায় স্পষ্টভাবে বিদ্যাসাগরের লেখনীর শক্তির উল্লেখ আছে। বিধবাবিবাহে বাধা যে অধর্ম তাও উল্লিখত হয়েছে। যারা বাধা দেয় তারা যে খল, এমন তিরস্কারসূচক কথাও প্রয়োগ করা হয়েছে। মনে হয় সমাজের নীতিবোধ ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল।

তারপর তিনি আন্দোলনে নামবার আগে তাঁর সংকল্পের কথা পিতা মাতাকে জানিয়ে তাঁদের সম্মতি আদায়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। পিতার কাছ হতেই বাধা পাবার সম্ভাবনা বেশী ছিল; কারণ তিনি প্রাচীন পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। তাই সোজা পিতার কাছেই তিনি প্রথমে যান এবং সোজাসুজি বলেন যে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে তিনি আন্দোলনে নামতে চান এবং এ বিষয় তাঁর সম্মতি চান। পিতা নাকি প্রথমেই তাঁকে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি যদি সম্মতি না দেন তাহলে পুত্র কি করবেন। পুত্রের উত্তরও হয়েছিল সুস্পষ্ট এবং সোজাসুজি। তিনি বলেছিলেন যে পিতার সম্মতি না পেলে পিতার জীবন-

কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আন্দোলনে নামবেন। পিতা সে উত্তর শুনে খুসী হয়েছিলেন মনে হয়, কারণ তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন এবং কাজে এগিয়ে যেতে বলেছিলেন। এই কাহিনী আমরা বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থে পাই।

এবার মার কাছে সম্মতি নেবার পালা। তাঁর কোমল হৃদয় বিধবাদের দুর্দশায় ঐকান্তিক বেদনাবোধ করত, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি সোজাসুজি সম্মতি দিলেন; কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে পিতার সম্মতি নাও মিলতে পারে। তিনি জানতেন না যে পিতার সম্মতি আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। কাজেই যখন সে কথা জানলেন তখন তাঁর বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রইল না।

এইবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল শাস্ত্র হতে অনুমোদনসূচক বিধান আবিষ্কার করা। মনে হয় মনুর ধর্মশাস্ত্রে যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল তা নয়। নীচে উদ্ধৃত শ্লোকটি তার প্রমাণ দেবেঃ

যা পত্যা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥
৯।১৭৫

তার অর্থ হল, যে নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে বা বিধবা হয়ে নিজের ইচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করে সন্তান উৎপাদন করে তার পুত্রকে পৌনর্ভব বলা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে পতিপরিত্যক্তা এবং বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ স্বীকৃত হয়েছে মনে হয়।

আমার ধারণা বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের প্রস্তাবের সপক্ষে আরও সবল যুক্তি সংগ্রহের জন্য স্পষ্টভাবে প্রবর্তক শাস্ত্রের নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে এইরূপ সমর্থক বচনের সন্ধান করেছিলেন। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি নাকি সমস্ত অবসর সময় এবং এমন কি ছুটির পরেও গভীর রাত্রি পর্যন্ত কলেজের পুস্তিকাগারের পুঁথি খুঁজে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন।

অবশেষে তিনি পুরস্কৃত হলেন। পরাশর সংহিতার এই শ্লোকটি তিনি আবিষ্কার করলেন ঃ

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

সুতরাং এইভাবে বাধাগুলি দূর হয়ে গেল। পথ প্রস্তুত হল, অস্ত্রও হাতে এল। এখন তাঁর ধারণা হল সরকারের নিকট বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের অনুকূলে আইন পাশ করবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা যেতে পারে।

যে আবেদনের পত্রটি সরকারের নিকট স্থাপিত হল তা সরকারের আইন সভার নিকট বাংলা প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষ হতে স্থাপিত হচ্ছে বলা হয়। তাতে বলা হল বিধবাদের ব্রহ্মচর্য পালন প্রথা 'নিষ্ঠুর ও স্বভাববিরুদ্ধ এবং নৈতিক জীবনের প্রতিকূল এবং অন্যভাবে সমাজের নানা ক্ষতিকর কুফলে পর্যবসিত।' অতিরিক্তভাবে বলা হল এই নিষেধসূচক 'রীতি শাস্ত্রের দ্বারা অনুমোদিত নয় এবং হিন্দু আইনের প্রকৃত ব্যাখার সহিত সংগতি রক্ষা করে না।' এই আবেদন পত্রে সকল প্রগতিশীল হিন্দু নেতাই স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রেমচাঁদ বড়াল, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রাজনারায়ণ বসু, মহেন্দ্রলাল লাল সরকার ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

যে বিদেশী জাতির তত্ত্বাবধানে সরকার তখন পরিচালিত বিধবাবিবাহের বিপক্ষে তাঁদের কোনও প্রতিকূল সংস্কার ছিল না। কাজেই যখন তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে বিধবাবিবাহের অনুকূলে শাস্ত্রের সমর্থক বাণী আছে, মানবিকতা-বোধ পরিচালিত হয়ে তাঁরা আইন সভায় আগ্রহের সহিত বিধবাবিবাহকে বৈধ বলে গ্রহণ করে এক বিল স্থাপন করলেন। আইন সভার অন্যতম সভ্য জে পি গ্রাণ্ট, তার সমর্থনে যে উক্তি করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন এই প্রস্তাবিত আইন 'কোনও মানুষের প্রবর্তিত রীতিতে বাধা দেবে না; অপর পক্ষে একশ্রেণীর মানুষকে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে এমন প্রতিবেশী পরিবারদের

ওপর নির্যাতন ও দুর্নীতি আরোপ করতে বাধা দেবে।'

এই ভাবে ২৬শে জুলাই ১৮৫৬ তারিখে, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ আইন পাশ করে সরকার হিন্দু বিধবার বিবাহ বিধিভূত বলে ঘোষণা করলেন। এ শুধু বিদ্যাসাগরের একক অভিযানের জয় নয়, সকল প্রগতিপন্থীর জয়। আশ্চর্যের কথা রক্ষণপন্থীরা বিরোধিতা করলেও দেশের সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থাকে সাদরে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

তার সুন্দর প্রমাণ মিলে যায় শান্তিপুরের তাঁতি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। তারা উৎকৃষ্ট তাঁতশিল্পী, দেশময় বিখ্যাত। তারা আইন পাশ হবার জন্য অপেক্ষা করেনি। তার আগেই বিদ্যাসাগরের শাড়ী নামে এক শাড়ী বার করে তার পাড়ে এই কবিতাটি বুনে দিয়েছিলঃ

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে
সদরে করছে রিপোর্ট বিধবার হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ে লেগে যাবে ধূম।

সুতরাং বোঝা যায় নবজাগরণের ঢেউ কেবল শিক্ষিত সমাজে সীমিত ছিল না তার স্পর্শ সাধারণ মানুষও, খেটে-খাওয়া মানুষও পেয়েছিল।

বিদ্যাসগর শুধু আইন পাশ করে ক্ষান্ত হননি; একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনেরও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাঁর অনুজ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তখন বিপত্নীক হয়েছিলেন। উভয়েই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। শ্রীশচন্দ্রকে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তিনি একজন বিধবাকে বিবাহ করাতে সম্মত করান। কন্যা নির্বাচিত হন এক কুমারী (virgin) বিধবা, নাম কালীমতী দেবী। এই বিবাহের তাৎপর্য গভীর, তাই তার প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর সেদিক হতে কোনও ত্রুটি রাখেননি।

তিনি নিজে কন্যাপক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিবাহের স্থান নির্ধারিত হয় ১২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধায়ের বাড়ীতে। নিমন্ত্রণ পত্র কন্যার বিধবা মাতার পক্ষ হতে সংস্কৃতে রচিত হয়। বিদ্যাসাগরের একটি বড় তৃপ্তির কারণ হয়েছিল এই দেখে যে অনেক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও নিমন্ত্রিত হয়ে সেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রথম বিধবাবিবাহ কলিকাতার নাগরিক জীবনের ইতিহাসে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা বর আসবার সময় রাস্তার দুধার কৌতুহলী দর্শকে ভরে গিয়েছিল। চলাচলের ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখবার জন্য পুলিশ প্রহরীর ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল ঃ

"রঙ্গতৎপর লোকসমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল সারজন সাহেবরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন।"

এর কয়েক বৎসর পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র পিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক বিধবা কন্যাকে বিবাহ করতে উদ্যত হন। এই নিয়ে পরিবারের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। তাঁর অনুজ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র, বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন নারায়ণচন্দ্রকে বিধবা বিবাহ করবার সংকল্প ত্যাগ করতে বলেন। তিনি তা বলেন নি। বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর শম্ভুচন্দ্রের চিঠির যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে, কেন সে অনুরোধ রাখতে পারেন নি, তার কারণ দিয়েছিলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি তাঁর চরিত্রের উপর সুন্দর আলোকপাত করে। তাই সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে

পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।"

(৪)

সেকালে বাংলাদেশে বহুবিবাহ-প্রথা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তার সঙ্গে কৌলীন্য-প্রথা জড়িত। তাই এ বিষয় কিছু প্রাথমিক কথা বলে নিলে এই কুপ্রথা কেন ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বোঝা যাবে।

বাংলাদেশে এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব খুব বেশী ছিল। ফলে বৈদিক যজ্ঞবিধি জানে এমন ব্রাহ্মণ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। রাজা আদিশূর এই সমস্যা সমাধানের জন্য কান্যকুব্জ হতে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আনেন। তাঁদেরই বংশধরগণ বর্তমানে বারেন্দ্র ও রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। পরবর্তী কালে দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেন কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ কুলাচার রক্ষার জন্য কতকগুলি বিধি নিষেধ অরোপ করেন।

কৌলীন্য-প্রথা চালু রাখতে প্রথম দিকে কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কয়েক পুরুষ পরে দেখা গেল কিছু কিছু পরিবার নানা অবাঞ্ছনীয় কাজে নিজেদের লিপ্ত করেছেন। দেবীবর ঘটক নামে এক সমাজনেতা বিষয়টি ভাল চোখে দেখলেন না। তিনি আচারের শুদ্ধতার ভিত্তিতে কুলীন পরিবারগুলিকে কতকগুলি উপশাখায় ভাগ করলেন এবং এই ব্যবস্থা করলেন যে বিবাহ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর উপশাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রথাই মেল বন্ধন নামে পরিচিত।

এর ফল হল মারাত্মক। একই উপশাখার মধ্যে পাত্র পাওয়া দুর্লভ হয়ে পড়ল। অথচ কন্যার বিবাহ না দিলেই নয়, সমাজ শাসন অনুসারে তা একান্তই বাধ্যতামূলক। কাজেই একই পাত্র বহু কন্যার কুমারীত্ব খণ্ডন করবার জন্য নির্বাচিত হতে লাগল। পাত্র শিশু হক, বৃদ্ধ হক, মেয়েকে নিয়ে ঘর করুক বা নাই করুক, সে প্রশ্ন অবান্তর, বিবাহ করে কন্যার কুমারীত্ব খণ্ডন করলেই পিতার কর্তব্য সম্পাদিত হয়ে যায়। ফলে যা পরিস্থিতি হল তা একান্তই অবাঞ্ছনীয়, বিবাহিত মেয়ে পিতৃগৃহে একরকম বিধবার জীবনই যাপন করতে লাগল।

এই প্রসঙ্গে বর্ধমানের মহতাব চাঁদের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা

যেতে পারে। তিনি বলেছেন "কুলীনরা অর্থের জন্যই বিবাহ করে, বিবাহ যে দায়িত্ব আনে তা বহন করবার কোনও উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। ফলে তাদের পত্নীরা নামে মাত্র বিবাহিত হয়, বিবাহিত জীবনের কোনও সুখভোগের আশা তাদের থাকে না। ফলে তাদের মনে যে ভালবাসার ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তা উপযুক্ত পাত্রের অভাবে হৃদয়ে শুকিয়ে যায়, অথবা ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার দোষে এবং কামনার তাড়নায় তারা দুর্নীতিস্পৃষ্ট হয়।"

এই শ্রেণীর মেয়েদের সমস্যা বিধবাদের সমস্যার সঙ্গে তুলনীয়। কাজেই বিধবাবিবাহ রীতি প্রচলিত হবার পর জনমত বহুবিবাহ প্রথার বিপক্ষে গড়ে উঠতে লাগল। বিদ্যাসাগর তখন এই প্রথা রহিত করবার সপক্ষে আন্দোলনে নামলেন। প্রথমত জনমত গঠনের জন্য তিনি প্রচার পুস্তিক, লিখলেন। তারপর তিনি সরকারের নিকট স্থাপনের জন্য একটি আবেদন পত্র রচনা করে তাতে ২১,০০০ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। আবেদন পত্রের তারিখ হল ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬। তাতে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নদীয়ার মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

এই আন্দোলন শুধু কলিকাতায় সীমাবদ্ধ থাকে নি; ঢাকা শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নেতৃত্বের ভার নিয়েছিলেন। বোঝা যায় নবজাগরণের হাওয়া পূর্ববঙ্গেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, জনসাধারণের মনের কথা ভাষা পেয়েছিল রামচন্দ্র চক্রবর্তী নামে ঢাকার এক কবির কবিতায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি সেনাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাইনা গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরষাণ কর গো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।

কবিতাটির অর্থবোধ করতে হলে তার পরিবেশের সঙ্গে কিছু পরিচিত হয়ে নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন সিপাই বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার সোজাসুজি গ্রহণ করেছেন। তাই তাদের রাণী ভিক্টোরিয়া আমাদের সম্রাজ্ঞী হয়েছেন। ক্যাম্বেল তখন ছিলেন বাংলার লেঃ গভর্নর। এখন কবিতাটি বোঝা সহজ হবে। বক্তব্য হল, রাসবিহারীর সাহায্যে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে কুলীন নারীগণ নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবেন।

কিন্তু আন্দোলন সফল হয়নি। সম্ভবত তার প্রধান কারণ হল রাজনৈতিক পরিবর্তন। কোম্পানীর আমলে সরকার আইন করে হিন্দু-সমাজ সংস্কারের যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, মহারাণীর আমলে সে নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সম্ভবত সিপাই যুদ্ধের পর ভারত সরকার নূতন করে ঝুঁকি নিতে সাহস করেন নি। এই দাবী পূরণ করতে হিন্দু নারীদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। জনমত ও অর্থনীতির চাপে বহুবিধবা-প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দুকোড পাশ হওয়ায় পুরুষের বহু-বিবাহের অধিকার লোপ হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্তি, দুর্ভাগ্যের সময় মহিলাদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তার চিন্তা। অকালে স্বামী মারা গেলে বা বার্ধক্যে তাদের অর্থকষ্ট হতে মুক্ত রাখবার জন্য তিনি পারিবারিক পেনসনের ব্যবস্থা করেন। এইভাবে তাঁর চেষ্টায় 'হিন্দু ফ্যামিলি এন্নুয়িটি ফাণ্ড' স্থাপিত হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। তার প্রথম অছি ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরাট মানুষ ছিলেন। তাঁর অনেক কীর্তি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অকারণে তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ বাঙালী' আখ্যায় ভূষিত করেন নি। তাঁর সকল কীর্তির মধ্যে আমার মনে হয় নারীজাতির উন্নয়নের চেষ্টা তাঁর জীবনে সব থেকে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাই দেখি তিনি নানা ভাবে নারীজাতির সেবা করে এসেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা

তাঁর জীবনের সব থেকে মহৎ কর্ম। নারীজাতির অধঃপতিত দশা হতে তাকে উন্নীত করবার আকাঙ্খা তাঁর মনে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তাঁর হৃদয়বত্তা এবং সংবেদনশীলতা। অন্যের যেখানে দৃষ্টি পড়ে নি, অথচ তাঁর পড়েছিল ; তার কারণ তিনি তাঁদের থেকে হৃদয়বত্তা-গুণে অধিক ভূষিত ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

নারীমুক্তি আন্দোলনে ঠাকুরবাড়ীর ভূমিকা

(১)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার একটি অনন্যসাধারণ গৌরবমণ্ডিত পরিবার। তার সংগে প্রতিযোগিতা করতে পারে এমন আর একটি পরিবার আমাদের বিশাল দেশের আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নাই। সম্পূর্ণ একটি শতাব্দী ধরে এই পরিবারের মানুষ বংলার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসন অধিকার করে এসেছেন। দ্বারকানাথ ব্যবসায় ও সমাজ উন্নয়নে, তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম-আন্দোলনে এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতির জগতে দেশের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু সমগ্র পরিবারের সন্তানদের মধ্যে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল যাতে তা সকল সাংস্কৃতিক এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য সকল কৃতিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের।

তাঁর সাধনা, ঋষিজনোচিত আচরণ এবং নিজ প্রবর্তিত ধর্মকে জাতীয় রূপ দেবার চেষ্টা তাঁকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করে গড়ে তুলেছিল। ফলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তাঁর পরিবারের মানুষ সকলেই তাঁকে অকুণ্ঠভাবে শ্রদ্ধা করত। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুদক্ষভাবে পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলে তাঁর পরিবার এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলেছিল যা তাঁর সন্তানদের জাতীয়তাবোধে, সংস্কৃতি-চর্চায় এবং সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে উৎসাহিত করত এবং অবাধ সুযোগ দিত। কার ঠাকুর কোম্পানি

(Carr Tagore & Company) দেউলিয়া হবার পর তাঁর সুব্যবস্থায় সকল ঋণ পরিশোধ হবার পর পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি মোটামুটি আর্থিক সচ্ছলতা এনে দিয়েছিল। জমিদারী হতে যা আয় হত তাতে বিরাট পরিবারের অবাধ বিলাসের সুযোগ ছিল না; কিন্তু সাংস্কৃতিক চর্চায় কোনও বাধা সৃষ্টি করে নি। অতিরিক্তভাবে মহর্ষির দৃষ্টান্ত এবং মিতব্যয়িতার গুণে পরিবারের মানুষ আলস্য ও বিলাসে গা ঢেলে দিয়ে সাধারণ জমিদার বাড়ীর ছেলের মত জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হন নি। তাঁরা নানা প্রগতিশীল আন্দোলনে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন এবং নানাভাবে সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করবার সাধনা করতেন।

মহর্ষি নিজে ধর্ম-আন্দোলনে এবং সাধনজীবনে ডুবে থাকলেও সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে তাঁর সহানুভূতি ছিল। কাজেই নারী-উন্নয়ন আন্দোলনেও তাঁর অন্তরের অনুমোদন ছিল। তার কয়েকটি ভাল প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন প্রথম বেথুন বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়, তখন তিনি তাঁর প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে সেখানে ভর্তি করে দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহকে আইনসম্মত করবার উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আন্দোলন-পত্র স্থাপন করেন, তখন মহর্ষি তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন। অনুরূপভাবে হিন্দুসমাজে পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথা রহিত করবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আবেদন-পত্র স্থাপন করেন, মহর্ষি তাতেও স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই তাঁর পরিবারের মানুষের পক্ষে নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল।

এখন সংক্ষেপে মহর্ষির পরিবারের মানুষরা নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার একটি পরিচয় দেবার প্রস্তাব করি। আমরা দেখব এতে বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বধূ সকলেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলে একটি জমিদার পরিবারে মেয়েদের যে অবরোধের মধ্যে বাস করতে হত, সে অবরোধ-প্রথা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নারীর শিক্ষা, নারীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান, নারীর সক্রিয় সাহিত্যচর্চা, এমনকি বাহিরে রাজনৈতিক আন্দোলনে

যোগ দেওয়া এই পরিবারের মহিলাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এ পরিবারে সেকালের রীতি অনুযায়ী নাকি কঠোরভাবে অবরোধ-প্রথা পালন করা হত। তার নিদর্শনস্বরূপ এখনও মহর্ষি-ভবনে এমন একটি সিঁড়ি আছে যা চারদিক হতে ঘেরা। সেটি নাকি অন্দরমহলে মহিলাদের উপরনীচে করবার জন্যে সংরক্ষিত ছিল। উদ্দেশ্য, এই সিঁড়ি ব্যবহার করলে বাহির মহলের কোনও পুরুষের দৃষ্টি তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। আরও কাহিনী আছে যে, সেকালে বাড়ীর মেয়েদের গঙ্গাস্নান করতে হলে অন্দরমহল হতেই পাল্কী চড়ে যেতে হত এবং পাল্কীর বাহিরে না যেতে দিয়ে পাল্কীশুদ্ধ তাঁদের জলে ডুবিয়ে দেওয়া হত।

(২)

মহর্ষির পরিবারে যিনি এই কঠিন পর্দাপ্রথা ভাঙতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি বেশ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে যে প্রথম এণ্টান্স পরীক্ষা হয়, তাতে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তখন সবে ভারতীয়দের নিকট সিভিল সার্ভিসের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। তিনি তাঁর সুযোগ নিয়ে বিলাতে গিয়ে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান হিসাবে পরের বৎসর বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কাজে যোগ দেন। পরে চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার কিছু আগে অবসর গ্রহণ করে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বালিগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন।

প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ন হিসাবে তাঁর খ্যাতি কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি হল তাঁর নারী-উন্নয়ন আন্দোলন। সেকালে গৌরীদানের যুগে নিতান্ত বালিকা বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত এবং স্বামীদের গৃহে এসে বাস করতে হত। তাদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যা বন্দিনী ভাবেই তাদের জীবন যাপন করতে হত। কর্মে, বচনে, চিন্তায় তাদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঘরের বাহিরে

মেয়েদের চলাফেরার কোনও স্বাধীনতা ছিল না। মনুর নির্দেশ অনুসারে বাল্যে পিতার অধীনে থাকতে হত, বয়স হলে স্বামীর অধীনে জীবন কাটত এবং বার্ধক্যে বিধবা অবস্থায় পুত্রের আশ্রিত হয়ে বাস করতে হত। মেয়েদের এই পঙ্গু, বদ্ধ জীবন বাল্যকালে সত্যেন্দ্রনাথের মনকে অত্যন্ত পীড়া দিত।

সুতরাং বাল্যকালেই সমাজব্যবস্থা অনুসারে নারীজাতির এই দুর্দশা তাঁর মনে গভীর সংঘাত সৃষ্টি করেছিল। তাই দেখি বাল্যকাল হতেই নারীর উপর এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে সুরু করেছিলেন। এই নিয়ে নিতান্ত বালক অবস্থাতেই মায়ের সঙ্গে তাঁর তর্ক লেগে যেত। তাঁর 'বাল্যকথা' নামে পুস্তকে এ বিষয় উল্লেখ আছে। তার প্রাসঙ্গিক অংশটি এই ঃ

"আমি ছেলেবেলা থেকেই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মা আমাকে অনেক সময় ধমকাতেন, 'তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?' আমাদের অন্তঃপুরে কয়েদখানার মত যে নবাবী বন্দোবস্ত ছিল, তা আমার আদবে ভাল লাগত না। আমার মনে হত, এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্ব নয়, মুসলমান রীতির অনুকরণ।"

তাই মনে হয় তিনি যেন উত্তর-জীবনে এই পরিবারে নারী-জাতির স্বাধীনতা স্থাপনকে জীবনের মুখ্য ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয় তাঁর মনের দৃঢ়তা এত বেশী ছিল যে, প্রয়োজন হলে গুরুজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তার সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের বিবাহের পরে একটি পারিবারিক ঘটনার মধ্য দিয়ে।

তাঁর বিবাহ হয় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সহিত। তাঁর পিতা ছিলেন যশোহরের মানুষ। কলিকাতায় তাঁর নিজস্ব কোনও বাড়ী ছিল না। একবার তাঁর পিতা কলিকাতায় একখানি বাড়ী ভাড়া করে সেখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। সে সময় তাঁর মা তাঁর কলিকাতার ভাড়া বাড়ীতে তাঁকে আনিয়ে নিয়ে কিছুকাল নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিক ইচ্ছা এবং অসঙ্গতও

নয়। কিন্তু বাদ সাধল সত্যেন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবীর সংস্কারবোধ। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ হল নিজের শ্বশুরবাড়ীর আভিজাত্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের অতিসচেতনতা। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের পুত্রবধূ হয়ে আত্মীয়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়ীতে উঠলে শ্বশুর পরিবারের মান থাকে না। তাঁর সংস্কার মেয়ের মায়ের ব্যাকুলতার কথা ভাবতে সুযোগই দিল না।

মায়ের এই নির্দেশের খবর সত্যেন্দ্রনাথের কর্ণগোচর হল। তিনি এটি নারীজাতির প্রতি অত্যাচারের নিদর্শন বলেই গ্রহণ করলেন। তাঁর মায়ের আদেশ তাঁর পত্নী ও কুটুম্বদের মনে গভীর বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি তখন পিতার নিকট গিয়ে সব বললেন এবং পিতাকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানালেন। মায়ের যা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল উদারহৃদয় পিতা তা সহজেই বুঝে ফেললেন। তিনি তখনই সারদা দেবীর কাছে গিয়ে যা বললেন তা আমরা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মুখে শুনে নিতে পারি। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন (ইন্দিরা দেবী সংকলিত 'পুরাতনী') ঃ

"এসে মাকে বললেন—সত্যেন্দ্রের বউ-এর মা তাকে নিতে পাল্কী পাঠিয়েছেন; তুমি নাকি ভাড়া বাড়ী বলে তাকে যেতে দাও নি ? ভাড়া বাড়ী কেন, মা গাছতলায় থাকলেও ও মায়ের কাছে যাবে। এখনি পাঠিয়ে দাও।"

আই সি এস পরীক্ষা দিতে গিয়ে বিলাতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবাস-জীবনে নারীকে অবরোধ হতে মুক্তি দেবার তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা আরও বলবতী হল। সে দেশে তিনি এমন একটি সমাজের মধ্যে স্থাপিত হলেন যেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা সর্বতোভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আহারে বিহারে সামাজিক অধিকারে সে দেশের নারী তখন পুরুষের সমস্থানীয়। অপরদিকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই সমাজের মানুষেরা তখন শৌর্যে, আধিপত্যে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছে। তাই তাঁর মনে হয়েছিল এই জাতির সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ তাদের মধ্যে স্ত্রী-স্বাধীনতা। তাঁর এই ধারণা সমর্থনযোগ্য বৈ কি। সমাজদেহ চলে দুটি পায়ের উপর নির্ভর করে। তাদের একটি যদি হয় পুরুষ অপরটি হল নারী।

একটি পা পঙ্গু হলে চলতে কত অসুবিধা হয়। আমাদের দেশের সমাজবিধি নারীকে পঙ্গু করে রেখেছে; তাই আমরা এত দুর্বল। অপরপক্ষে এরা নারীকে সমান অধিকার দিয়ে সমানে সহযোগিতা করবার সুযোগ দিয়েছে। তাই তারা এত প্রবল জাতি। এই ধরনের চিন্তা তাঁর মনে তখন ক্রিয়া করছিল। প্রবাস হতে তাঁর পত্নীকে তিনি যেসব চিঠি লিখতেন তাতে এই ধরনের চিন্তা প্রকট হত। তাদের একটি হতে প্রাসঙ্গিক অংশটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"এ দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যত বিষয়েই ভিন্নতা থাকুক, এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সুন্দর, প্রশংসনীয়, স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল। আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের বাক্যই তাহাদের জীবনের নিয়ম, সেখান হইতে স্ত্রী সৌভাগ্য অনেক দূর। (১৬।১১।১৮৬৩ তারিখের চিঠি)।

এইসব চিন্তার ফলে প্রবাস-জীবনে তাঁর মনে একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়েছিল যে, তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনীকে বিলাতে আনিয়ে সেখানকার সমাজের সহিত পরিচয় করিয়ে দেবেন। সেখানকার সমাজের সহিত পরিচিত হলে সেখানে মেয়েরা কতখানি স্বাধীনতা ভোগ করে, তার আস্বাদ পেলে এঁরও মনে নিজের দেশে অনুরূপ সামাজিক পরিবেশ রচনা করবার প্রেরণা আসবে। অর্থাৎ নারীস্বাধীনতা-আন্দোলনে সহধর্মিণীকে সহযোদ্ধায় রূপান্তরিত করবার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি প্রবাস জীবনে তাঁকে কাছে চেয়েছিলেন। এই প্রস্তাবটি তাঁর পিতার নিকট তিনি স্থাপনও করেছিলেন। কিন্তু মহর্ষি নানা বিষয়ে উদার হলেও তাঁর স্বাভাবিক রক্ষণশীল মনোভাব এ-প্রস্তাবে তাঁকে সম্মতি দিতে বাধা দিয়েছিল। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথের সে ইচ্ছা তখন অপূর্ণ রয়ে যায়। সে দুঃখ তিনি স্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে লিখে মনকে হাল্কা করতে চেয়েছিলেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"আমি একবার ভাবিয়াছিলাম তুমি যদি কোন রকম করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া এখানকার উন্নত সমাজের মধ্যে বাস করিতে পার তবে আমার এখানে যাহা কিছু শিক্ষা ও উন্নতি লাভ হইয়াছে, তুমিও তাহার ভাগী হইতে পার। এই অভিপ্রায়ে তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন, বাবা মহাশয়কে লিখলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবা মহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি।" (২।৪।১৮৬৪ তারিখের চিঠি)।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান পদে নিযুক্ত হয়ে বোম্বাই প্রদেশে কাজে যোগ দেবার আগে তিনি কলিকাতায় আসেন। তখন তিনি মনকে প্রস্তুত করে ফেলেছেন যে, দেশে তাঁর অন্যতম ভূমিকা হবে মেয়েদের পিঞ্জরাবদ্ধ অবরুদ্ধ অন্তঃপুরিকার বিড়ম্বিত জীবন হতে মুক্তিদাতার। এই উদ্দেশ্যের কথা তাঁর স্মৃতিচারণে স্পষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটি এই :

"আমাদের স্ত্রীরা পর্দার অন্ধকারে কি খর্বাকৃতি বদ্ধ জীবন যাপন করেন—উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে তাঁদের মন কি সংকীর্ণ —তাঁদের স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়া কিছুই স্ফুর্তি পায় না। বিলেত থেকে ফিরে এসে পর্দা উচ্ছেদ স্পৃহা আরও জেগে উঠল।" (আমার বাল্যকথা)।

এই পর্দা উচ্ছেদ অভিযান তাঁর পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে নিয়েই সুরু হয়েছিল। এ বিষয় তিনি স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণীর ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী যখন চাকুরীতে যোগ দেবার জন্য বোম্বাই রওনা হন, তিনি তখন পর্দা হতে নিজেকে মুক্ত করেই বেরিয়েছিলেন। সেই প্রথম এ-বাড়ীর বধূ দশজন পুরুষের সামনে প্রকাশ্যে বাহির হয়েছিলেন। তারপর প্রবাসে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের পত্নীরা যেভাবে জীবন যাপন করতেন সেইভাবেই জীবন যাপন করেছিলেন।

এইভাবে পত্নীকে প্রবাসে মুক্ত জীবনের সহিত অভ্যস্ত করিয়ে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ যখন প্রথম জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ছুটি কাটাতে আসেন তখন পর্দাপ্রথা ভাঙার কাজ পরিবারের মধ্যেই

আরম্ভ করে দেন। কলিকাতায় লাটপ্রাসাদ হতে বিলাতী রীতি অনুসারে তাঁদের উভয়েরই নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাঁরা উভয়েই সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ীর প্রচলিত পর্দাপ্রথার উপর দারুণ আঘাত হেনেছিলেন, এ-কাহিনী সত্যেন্দ্রনাথের নিজের মুখেই শোনা যেতে পারে। 'আমার বাল্যকথা'য় তিনি লিখেছেন ঃ

"আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গভর্নমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহাব্যাপার! শত শত ইংরেজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী সেখানে একটি মাত্র বঙ্গবালা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি তো ঘরের বৌকে প্রকাশ্য স্থলে দেখে রাগে, লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।"

প্রসন্নকুমার ছিলেন এই ঠাকুরপরিবারেরই পাথুরিয়াঘাটা শাখার বিখ্যাত মানুষ। তিনি সম্পর্কে মহর্ষির পিতৃব্যস্থানীয় এবং সেই অধিকার বলে ঠাকুর পরিবারের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এ-ঘটনা কলিকাতার সমাজে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। রক্ষণশীল সমাজ যেমন আঘাত পেয়েছিল, সমাজের প্রগতিশীল অংশ তেমন তাতে খুসী হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে আই. সি. এস. পরীক্ষা উপলক্ষ্যে প্রবাসে থাকবার সময় সত্যেন্দ্রনাথের মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছিল যে, তাঁর পত্নীকে ইংলণ্ডের সমাজের সহিত পরিচিত করিয়ে দেবেন। মহর্ষি আপত্তি করায় তাঁর সে ইচ্ছা তখন পূর্ণ হয়নি। সে ইচ্ছা কিন্তু তিনি ত্যাগ করেন নি। সে ইচ্ছা পূরণের সুযোগ এল যখন তিনি বোম্বাই প্রদেশের সিভিলিয়ান জীবন যাপন করছেন।

তখন প্রথম সুযোগেই সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। তিনি এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সন্তানদের নিয়ে বেশ কিছুকাল একাই স্বাধীনভাবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রবাসে সংসার চালাতে অভ্যস্ত হন। তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। তাতে যেমন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর বিলাতের সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের সুযোগ হবে, তেমনই তিনি আত্মনির্ভর হতে

শিখবেন, পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার অভ্যাস পরিবর্তিত হবে।

সেই কারণে ব্যবস্থা হয়েছিল এই রকম। তখন তাঁদের দুই পুত্র ও এক কন্যা। ঠিক হল তিনটি সন্তানকে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একাই আগে রওনা হয়ে হবেন। এইভাবে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক ইংরেজ দম্পতীর সঙ্গে তিনি বিলাত রওনা হয়ে যান। বিলাতে প্রথম তিনি ওঠেন মহর্ষির জ্ঞাতিভ্রাতা প্রসন্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনের লণ্ডনের বাড়ীতে। সেখান হতে পরে ব্রাইটনে গিয়ে তাঁরা বাস করতে আরম্ভ করেন। পরে সত্যেন্দ্রনাথ লম্বা ছুটি নিয়ে তাঁদের সহিত যোগ দেন এবং সকলে মিলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতে ফিরে আসেন। বিলাতে একাকিনী প্রবাস-জীবন যাপন করে তিনি নিশ্চয় পাশ্চাত্য মহিলাদের মত স্বাবলম্বিনী হবার ক্ষমতা ভালভাবে অর্জন করে-ছিলেন। তার খুব ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হতে। প্রবাসে একা থাকার সময় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি গুরুতররূপে পীড়িত হয়ে পড়ে এবং মারা যায়। তার চিকিৎসা করা, সেবা করা এবং নিদারুণ সন্তানবিয়োগশোক সঙ্গীবিহীন অবস্থায় একাকী বহন করা—সবই তিনি পেরেছিলেন।

এইভাবে দীর্ঘ প্রবাসবাসের ফলে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্বামীর স্ত্রীস্বাধীনতার সপক্ষে অভিযানের উপযুক্ত সহধর্মিণী হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। বিলাতের নারী সমাজের সংস্পর্শে এসে তিনি স্বামীর আশা পূরণ করেছিলেন, তাঁদের সদ্‌গুণগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করে। স্বামী যা চাইতেন, নিজের আচরণ ও দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি শুধু ঠাকুরবাড়ীর পর্দাপ্রথার বিলোপসাধন করেননি, দেশের স্ত্রীস্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রাথমিক কাজও এগিয়ে দিয়ে-ছিলেন। স্বামী নিজের মনে মহিলাদের দুর্গতিমোচনের জন্য যে ইচ্ছা পোষণ করতেন, তিনি উপযুক্ত সহধর্মিণীরূপে তা পূরণ করেছিলেন।

এই অভিযানের ফলে ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহলে দারুণ পরিবর্তন এসেছিলেন। তার একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর স্মৃতিকথায়। তার

প্রাসঙ্গিক অংশটি এই ঃ

"আমাদের বাড়ীতে মেজদাদাই এ সমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন সেমিজ, জামা, জুতা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া বাহির হইতে লাগিলাম, তখন চারিদিক হইতে যে কিরূপ ধিক্কার উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নহে।" (সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি)।

সৌদামিনী দেবী জোড়াসাঁকোর বাড়ীর মেয়েমহলে আমূল পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন তার প্রেরণা সত্যেন্দ্রনাথের কাছ হতে এসে থাকলেও, তাকে রূপ দিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তিনি দুঃসাহসিকতার সহিত আপন আচরণের মধ্য দিয়ে এই সকল পরিবর্তন প্রবর্তন করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কিছু তথ্য এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। সেকালে মধ্যবিত্ত বা ধনী হিন্দু মেয়েরা একরকম অবরোধবাসিনী হয়ে থাকতেন। যে পরিবারের আভিজাত্য যত পরিমাণে বেশী, সেই পরিমাণে অবরোধবাসের কঠোরতা বেশী ছিল। ঠাকুরবাড়ীতে মেয়েরা পাল্কী ছাড়া বাড়ীর বাহিরে যেতে পারতেন না। তখনকার এই অবরোধপ্রথার কঠোরতার ফলে মেয়েদের বাহিরে যাবার উপযুক্ত বেশও ছিল না। বাড়ীর অন্দরমহলে একখানি সাড়ি মাত্র অবলম্বন করে শালীনতা রক্ষা করতে হত। বাহিরে গেলে তার উপর একটি চাদর গায়ে ঢাকা দেওয়া হত। আর ঘোমটা এমন লম্বা হত যে মুখ একেবারে ঢাকা পড়ে যেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রথম বাহিরে যাবার সজ্জা উদ্ভাবন করে বাঙালী মহিলার অবরোধপ্রথা ভাঙবার পথ উন্মুক্ত করে দেন। তিনিই প্রথম মেয়েদের মধ্যে অন্তর্বাস ব্যবহার প্রথা প্রচলিত করেন। এমন কি বর্তমানে যে 'হবল' করে সাড়ি পরবার রীতি প্রচলিত তিনিই বাঙালীর সমাজে এই ধরনের রীতি প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন।

(৩)

মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথেরও নারী-উন্নয়ন-আন্দোলনে কিছু ভূমিকা ছিল। তা সামান্য হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি পরিবারের ছেলেদের এবং মেয়েদের বাংলা সাহিত্য শিক্ষা দেবার ভার গ্রহণ

করেছিলেন। আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হতে জানতে পারি শৈশবে এক সময় হেমেন্দ্রনাথই তাঁর শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর কাছে শৈশবে বাংলা শিক্ষা করে ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন সে কথা তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান প্রসঙ্গে যা তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল তিনি মেয়েদের এবং পুত্রবধূদেরও বাংলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার পাঠ এক রকম ছিল না। কারণ, একটা সংস্কার গড়ে উঠেছিল যে লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। ঠাকুরবাড়ীর তরুণরা এ-রীতি মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বিবাহ হত নিতান্ত বালিকা বয়সে এবং অক্ষর-জ্ঞানবিহীন অবস্থাতেই তাঁরা শ্বশুরবাড়ীতে বাস করতে আসতেন। তাই হেমেন্দ্রনাথ বাড়ীতে বাংলা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে যে সব বালিকাবয়সী নবীন বধূরা আসতেন, তাঁরাও তাঁর কাছে বাংলা শিখতে বাধ্য হতেন। তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী।

(৪)

এইবার এই বাড়ীর আর এক বধূর নারী-উন্নয়ন-আন্দোলনে ভূমিকার কথা উল্লেখ করবার সময় হয়েছে। তিনি হলেন মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই তারিখে তিনি এই বাড়ীতে বধূরূপে আসেন। এই বাড়ীর নূতন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে তিনি নিজেকে মনের মত করে গড়ে তোলেন। সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে কাব্যসাহিত্যের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। সেই সূত্রে তাঁর অল্পকালস্থায়ী জীবনে দেশকে তিনি দুটি জিনিস দিয়ে গেছেন। প্রথম হল স্নেহ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, প্রয়োজন হলে নিরুৎসাহ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যশক্তিকে তিনি পরিস্ফুট করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে না। কাজেই সবিস্তারে আলোচনা নিস্প্রয়োজন। দ্বিতীয় হল এই বাড়ীতেই অন্দরমহলে সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি অবরোধ-জীবনের উপর একটি আঘাত হেনে-ছিলেন। আমাদের আলোচনা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হতে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি সেখানে বলেছেন ঃ

"সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে— তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চার আমি অংশীদার ছিলাম।"

সে-সময় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পরিগণিত হতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করে এবং বাংলায় সনেট লিখে বাংলা কাব্য সাহিত্যে এক নূতন যুগ এনেছিলেন। তাঁর অনুসরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন আরও মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। বিহারীলাল ঠিক সে পথে যাননি। তাঁর আকর্ষণ ছিল গীতি-কবিতার প্রতি। প্রকৃত গীতি-কবিতার বাংলা সাহিত্যে আমদানি তিনিই প্রথম করেন। সুতরাং এ-বিষয় তিনি পথপ্রদর্শক ছিলেন। তরুণ বয়সের রচনায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের বন্ধু। সেই সূত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল। কাদম্বরী দেবী তাঁর ''সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। শ্রদ্ধা জানাতে তাঁকে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। এইভাবে দুজনের মধ্যে একটি মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। একজন কবি, অপরজন ভক্ত, কাব্যই এঁদের যোগসূত্র। এইভাবে কাদম্বরী দেবীর সাহিত্য-প্রীতি অন্দরমহলের কঠোর অবরোধ ভাঙায় সাহায্য করেছিল। বাহিরের মানুষের জন্যও সেখানে দরজা খুলে গিয়েছিল।

কাদম্বরী দেবী এই শ্রদ্ধাভাজন কবিকে শুধু খাইয়েই তৃপ্তি পান নি, তাঁকে কিছু উপহারও দিয়েছিলেন। সেই উপহারকে কেন্দ্র করে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছিল। কাদম্বরী দেবী স্বহস্তে একটি আসন বুনে তার মাঝখানে কবির 'সারদামঙ্গল' হতে এই স্তবকটি উদ্ধৃত করে বসিয়েছিলেন ঃ

হে যোগেন্দ্র, যোগাসনে

ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও।

মনে হয় এটি শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা নয়, এর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি ধ্বন্যর্থ ছিল। কাদম্বরী দেবী এ-প্রশ্ন কবিকেই করেছিলেন। কবি বিহারীলালও তার মধ্যে সেই অর্থই পেয়েছিলেন। তাই দেখি, এই গুণী মহিলার অকাল মৃত্যুর পরে তাঁর উপহৃত আসনে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল কবি একটি স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থে তার উত্তর দিয়েছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'সাধের আসন'। তিনি বলেছিলেন যোগেন্দ্র মহাদেবের ধ্যানের বিষয় ছাড়া আর কিছু তিনি জানেন না এবং সেই কাব্যগ্রন্থে যোগেন্দ্রের ধ্যানের বিষয়কেই স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং কাব্যটির জন্মকথা যেমন নাটকীয় তার বিষয়বস্তুও অসাধারণ। নেপথ্যে থেকে কাদম্বরী দেবী নানাভাবে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে গেছেন।

কাদম্বরী দেবীর আনুকূল্যে আর একটি অভাবনীয় জিনিস সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য এ বিষয় উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁর স্বামী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশও অনুকূল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাটক যখন বাঙালী উদ্যমে প্রথম সুরু হয়, তখন অপেশাদার মহলে পুরুষ দ্বারাই নারীচরিত্র অভিনীত হত। সেকালের পর্দার যুগে গৃহস্থ-ঘরের মহিলারা এসে নারীচরিত্র অভিনয় করবেন, তা ছিল অভাবনীয়। কিন্তু এ বিষয় কাদম্বরী দেবীই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে।

(৫)

মহর্ষির মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের প্রথম পুত্র গণেন্দ্রনাথের নাট্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বাস করতেন ৫ নং বাড়ীতে। সেটা এখন নাই। তার জায়গায় যে মাঠ আছে সেখানে আজ-কাল রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জোড়াসাঁকো নাট্যশালা স্থাপন করেন। এই বৎসরেই সেখানে তিনি মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করান। সেই অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অহল্যা দেবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয়েছিলেন।

আরও কিছুকাল পরে দেখি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহে ঠাকুরবাড়ীতে বিদ্বজ্জন সমাগম নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাতে যেমন সাহিত্যচর্চার ব্যবস্থা ছিল, তেমনি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। একে উপলক্ষ্য করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধের উদ্দীপক নানা নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটক শুধু বিদ্বজ্জন সভায় পঠিত হত না অভিনীতও হত।

এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত একটি নাটকের অভিনয় আমাদের কাছে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি হাস্যরসাত্মক নাটক রচনা করে তার নাম দেন 'এমন কর্ম আর করব না'। তার নাম পরে পরিবর্তন করে 'অলীক বাবু' রাখা হয়। সেই নামেই তা এখনও জনপ্রিয় হয়ে বেঁচে আছে। এখন আমাদের সম্পর্ক বিদ্বজ্জন সমাগমের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নাটকের ঠাকুরবাড়ীর মানুষদের দিয়ে প্রথম অভিনয় নিয়ে।

নাটকটি রচনার অল্পকাল পরেই অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকে হেমাঙ্গিনী চরিত্রে তাঁর পত্নী কাদম্বরী দেবী অভিনয় করেছিলেন। সুতরাং তিনি বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে স্ত্রীচরিত্রের ভূমিকায় বাংলাদেশে প্রথম অভিনয় করেছিলেন। নারীপ্রগতির পথে এটি নিশ্চয় একটি বড় পদক্ষেপ। সুতরাং এটি তাঁর বড় কৃতিত্ব।

এর পরে ঠাকুরবাড়ীতে নারীচরিত্রে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েরাই নামতেন। আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে স্থাপন করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বিলাত থেকে ফিরে এসে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামে গীতিনাট্যটি রচনা করেন। তাও বিদ্বজ্জন সমাগমের পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাকুরবাড়ীর ছাদে অভিনীত হয়। তাতে রবীন্দ্রনাথ অংশগ্রহণ করেন। সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করেন হেমেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা প্রতিভা দেবী। পরে বিখ্যাত ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়েছিল। এইভাবে ঠাকুরবাড়ীর আনুকূল্যে রঙ্গমঞ্চে পুরনারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই দৃষ্টান্তের সুদূরপ্রসারী ফল ফলেছিল অরেও অনেক পরে। মণিপুরে ঘরের মেয়েরা নাচে ও নাচ দেখে, কারণ তা সেখানে পূজার

অঙ্গ বলে স্বীকৃত। আমাদের সমাজে মেয়েদের নাচ একেবারেই অপাংক্তেয় ছিল। যে-মেয়ে নাচত তার সমাজে কোনও স্থান ছিল না এবং যারা সে নাচ দেখত, তাদেরও মানুষ শ্রদ্ধা করত না। এশিয়ার অন্যত্র কিন্তু নৃত্য উচ্চ স্থান পেয়েছে। জাপানী মেয়েদের নৃত্য আদরের বস্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন জাপানে যান, তখন মাননীয় অতিথি হিসাবে তাঁকে জাপানী মেয়েদের নাচ দেখান হয়। সে নাচের উৎকর্ষ যেমন তাঁকে মুগ্ধ করে, তেমন তাদের অঙ্গসজ্জার শালীনতাও মুগ্ধ করেছিল (জাপান যাত্রী-১৪)। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যাভা ভ্রমণে গিয়ে তিনি বলিদ্বীপের নাচ দেখে আসেন। বলিদ্বীপবাসীরা হিন্দু। তাদের মেয়েরাও নৃত্যকে ধর্মের অঙ্গ করে নিয়েছে। তাদের নাচও তাঁকে মুগ্ধ করে।

জাপানী মেয়েদের নৃত্য দেখে শান্তিনিকেতনের উৎসবে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যকে স্থান দেওয়ার ইচ্ছা হয় তার ফলে দেখি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের উৎসবে নৃত্য স্থান পেয়েছে। সেই বৎসর 'অচলায়তনে'র গানের সঙ্গে মূকাভিনয় ও দেহভঙ্গির সাহায্যে গানের ভাবের রূপ দেওয়া হয়েছিল। তাই দেখি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মনিপুরী রীতিতে 'নটীর পূজা'র নৃত্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'নটরাজ' কাব্যনাট্যের সঙ্গে মনিপুরী নৃত্য সংযোজিত হয়। একই সময় এর পরিবর্তিত রূপ 'ঋতুরঙ্গে' দক্ষিণী রীতির নৃত্য প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ কথাকলি ও ভরতনাট্যম্-এর প্রভাব তার ওপর এসে পড়ে।

পরের অবস্থায় দেখা যায় শুধু নৃত্যনাট্য নয়, বিদেশী নৃত্যেরও সংযোজন সুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যরীতিতে নানা রীতির সংমিশ্রন ঘটেছে। উদ্দেশ্য, অভিনয়কে যতখানি সম্ভব মাধুর্যমণ্ডিত করা। এখানে নাট্যরথ যেন নৃত্য ও সঙ্গীতের যুগল অশ্ব দ্বারা দর্শকের হৃদয় অধিকার করবার অভিযানে পরিচালিত করা হয়েছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে 'নবীনে'র অভিনয়ে যে নৃত্য প্রবর্তিত হয় তাতে যেমন মণিপুরী রীতি স্থান পেয়েছিল, তেমন বাউল নৃত্য, রাইবিশে নৃত্য এবং হাঙ্গেরীর লোকনৃত্য সংমিশ্রিত হয়েছিল। এই বছরেই 'শাপমোচনে'র অভিনয় ব্যালে নাচের আদর্শে গড়ে তোলা

হয়। এই সব নৃত্যে মেয়েদের অংশ মেয়েরাই অভিনয় করত।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যরীতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্যাভিনয়ে। দুবছরেয় মধ্যে অন্য দুটি নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'র নৃত্যরূপ গড়ে ওঠে। প্রতিক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব পূর্বের রচনা হতে সংগৃহীত কাহিনী অবলম্বন করে নৃত্যনাট্যের উপযোগী সংগীতধারা রচনা করেন। তারপর নিজের তত্ত্বাবধানে তাদের নৃত্যরূপ দেন। তাদের মধ্যে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের ত্রিবেণী-সঙ্গম ঘটেছিল। তারপর এই নৃত্যশিল্পীগোষ্ঠী বিখ্যাত শিল্প-পরিবেশক হরেন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে ভারতের নানাস্থানে নৃত্য দেখিয়ে আমাদের সংস্কৃতির একটি নূতন দিগন্ত প্রসারিত করে দেয়। ঘরের মেয়েরা, ছাত্রীরা এখানে শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

সুতরাং বলা যায়, ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্টতম মানুষের নেতৃত্বে নারীর অধিকার নৃত্যমঞ্চেও স্থাপিত হয়েছিল। এইভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে নারীর মুক্তি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(৬)

বর্তমান যুগে বাঙালী মহিলারা সাহিত্যশিল্পী হিসাবে সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। এই বিষয়েও প্রথম পথ প্রদর্শন করেন ঠাকুরবাড়ীরই এক মেয়ে। নাম স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের থেকে পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে সাহিত্যরচনায় অতি অল্পবয়সেই আকৃষ্ট করে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য সাধনা আজীবন চলেছিল। কারণ, দেখি তাঁর শেষ গ্রন্থ 'দিব্যকথন' নাটক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তার দুবছর পরেই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তিনি শুধু এই বিষয় পথ পথপ্রদর্শিকা ছিলেন না। রচনার পরিমাণ ও সাহিত্যিক গুণও তাঁর যথেষ্ট ছিল। দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক, স্বরলিপি পুস্তক, সংকলিত পুস্তক ছাড়াও তিনি ২৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন ঃ

"পরে জানকী বিলাত যাইবার সময় আমার কনিষ্ঠা (অনুজা) ভগিনী স্বর্ণকুমারী আমাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসায় সাহিত্যচর্চায় আমরা তাঁহাকে একজন যোগ্য সঙ্গীরূপে পাইলাম।"

পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও স্বর্ণকুমারী দেবী নিজেকে প্রথম মহিলা সম্পাদিকারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া পত্রিকা 'ভারতী' ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করে। দ্বিজেন্দ্রনাথ তার প্রথম সম্পাদক। নয় বৎসর পর স্বর্ণকুমারী দেবী এই সাংস্কৃতিক পত্রিকার সম্পদনার ভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৬ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো (?) বৎসর কাল তার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।*

(৭)

ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চা ছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভ করে চন্দ্রমুখী বসুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে-ছিলেন। তাঁরা হলেন ঠাকুরবাড়ীর দুই মেয়ে, সরলা দেবী ও ইন্দিরা দেবী। প্রথমা হলেন স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা এবং মহর্ষির দৌহিত্রী। দ্বিতীয়া হলেন সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা এবং মহর্ষির পৌত্রী। সরলা দেবী ছিলেন ইন্দিরা দেবী হতে এক বছরের বড়। উভয়েই অনার্সসহ বি এ পাশ করেন। সরলা দেবী পাশ করেন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আর ইন্দিরা দেবী তার দু'বছর পর। তিনি ঘরে পড়ে ফরাসী ভাষায় অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন।

সরলা দেবী 'জীবনের ঝরা পাতা' নামে যে আত্মজীবনী রচনা করে গেছেন তাতে অনেক কথা পাওয়া যায়। তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যে অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁর মা 'ভারতী' পত্রিকার

* 'জীবনের ঝরাপাতা'-গ্রন্থের রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রকাশিত (১৯৭৫) সংস্করণের ২১৭ পৃষ্ঠা হইতে 'ভারতী' পত্রিকার বিভিন্ন সম্পাদক সম্পাদিকার নাম ও কার্যকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল: দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রাবণ ১২৮৪-১২৯০; স্বর্ণকুমারী দেবী, ১২৯১-১৩০১; হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী, ১৩০২-১৩০৪; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩০৫; সরলা দেবী, ১৩০৬-১৩১৪; স্বর্ণকুমারী দেবী, ১৩১৫ ১৩২১; মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৩২২-১৩৩০; সরলা দেবী, ১৩৩১-আশ্বিন ১৩৩৩।—সঃ

সম্পাদিকার দায়িত্ব হতে অবসর** গ্রহণ করবার পর তিনি ও তাঁর অগ্রজ ভগিনী হিরন্ময়ী দেবী দুই বৎসর সেই পত্রিকার সম্পদনা করেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।*** তিনি তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে তিনি নিজে সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়ে তা তাঁর রবিমামাকে শোনাতেন এবং রবীন্দ্রনাথ তার অনুসরণে কিছু কিছু সঙ্গীত রচনা করে তাতে সরলা দেবী প্রদত্ত সুর প্রয়োগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন 'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আমার সোনার বাংলা' প্রভৃতি। তাঁর চরিত্রের একটি বড় গুণ ছিল তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করে যা ভাল বুঝতেন তা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমালোচনা করে কিছু প্রতিকূল মন্তব্য করেন। সরলা দেবী তা অনুমোদন করতে পারেন নি। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই ঃ

"বড় হয়ে যখন বিচার-বিবেচনাশক্তি খানিকটা উদ্বুদ্ধ হল তখন বঙ্কিমকে পড়ে দেখে অনুভব করলুম, বঙ্কিমের প্রতি সুবিচার করিনি আমরা, সেদিন মাতুলভক্তিতে অযথা বঙ্কিম-মত-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলুম।" (জীবনের ঝরাপাতা)।

তাঁর স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার এবং তা নির্ভয়ে প্রকাশ করবার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আমরা পাই। মহর্ষি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং হিন্দুধর্মের প্রতীকপূজাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তাকে পৌত্তলিকতা বলতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর পরিবারেও অল্পবিস্তর এই প্রতীকপূজার বিরোধী মনোভাব সক্রিয় ছিল। কিন্তু তিনি মহর্ষির দৌহিত্রী হয়েও এই সংস্কারকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নূতন কথা বলতে সুরু করলেন। সে কথা তাঁর মুখেই শোনা যাক ঃ

"কোরাণ ও বাইবেলের দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন রায় সাকার পূজার বিরোধী হয়ে কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপসনার

** স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় দফায় সম্পাদনা-কাল ঃ ১৩১৫ ১৩২১। মোট সম্পাদনা কাল প্রায় ১৮ বৎসর। - সঃ

*** রবীন্দ্রনাথ মাত্র এক বৎসর সম্পাদনা করেন (১৩০৫ বঙ্গাব্দ), —সঃ

প্রচার করেন। খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারার টীকা নেওয়া ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে আকারবর্জিত নিরাকার ঈশ্বরের প্রণিধানের পক্ষপাতী হল। কিন্তু পারলে কৈ? ঈশ্বরের চরণকল্পনা ব্যতিরেকে তাঁকে প্রণিপাত করা যায় না, ··তাঁর আঁখি কল্পনা ব্যতিরেকে দিবীব চক্ষুরাততম্—আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহমাখা নির্নিমেষ আঁখি দেখা যায় না। তা দোষের নয়, কারণ খৃষ্টানরাও তাই করেন। কিন্তু ছবিতে, মৃত্তিকায় বা প্রস্তরে আমার কাল্পনিক ভাবমূর্ত্তিকে আকারযুক্ত করলেই Heathenism হল।" (জীবনের ঝরাপাতা)

সরলা দেবীর এই মন্তব্যগুলি দেখায় তিনি গতানুগতিক পথে চলতে চাইতেন না, নিজের স্বাধীন চিন্তায় যা ভাল বুঝতেন তাই বলতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা। পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবকে তিনি উপেক্ষা করতেন।

সরলা দেবীর সব থেকে বড় কীর্তি হল রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় অনুপ্রবেশ। তিনি বাঙালীর দুর্বলতা এবং অত্যাচারের প্রতিবাদ করবার অক্ষমতা সহ্য করতে পারতেন না। কলিকাতায় সেকালে বাঙালীর জীবন অতি হেয় অবস্থায় অধঃপতিত হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়মের গোরা সৈন্য ময়দানে যখন বেড়াতে বের হত, পথে বাঙালী যুবক দেখলে লাথি মারত। কোনও সঙ্গত কারণ তার ছিল না; তারা যে শাসক জাতির প্রতিনিধি সেটাই তারা এই অপমানকর আচরণ দিয়ে প্রমাণ করে উল্লাস বোধ করত। কিন্তু বাঙালী তরুণ এত ভীরু ছিল যে তার প্রতিবাদ করতে সাহস করত না; অপমান নীরবে সহ্য করে কাপুরুষের মত ফিরে আসত।

বাঙালী তরুণের এই সাহসিকতার অভাব সেই তেজস্বিনী মহিলার মনে বড় আঘাত দিয়েছিল। তিনি তাই বাঙালীকে বীর হতে, সাহসী হতে শিক্ষা দেবার এক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি সেইজন্য দুর্গাপূজার অঙ্গ হিসাবে বীরাষ্টমী ব্রত প্রচলিত করেন। অষ্টমীর দিনে তরুণদের ব্রত নিতে হত কাপুরুষতা ত্যাগ করে বীর হবার, নির্ভীক হবার। অত্যাচার হলে অত্যাচারীকে প্রত্যাঘাত করতে তিনি শিক্ষা দিতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে অসংখ্য তরুণ বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা

যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সে পরিবেশ রচনা করায় তাঁর একটি সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ইন্দিরা দেবী ছিলেন তুলনায় ধীর প্রকৃতির মানুষ এবং রবিকাকার একান্ত ভক্ত। পিতামাতা পরিবারে যে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন, তিনি তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে সকল সুপ্ত গুণগুলি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি উচ্চতম সম্মান লাভ করেছিলেন বি এ পরীক্ষায় ফরাসী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে। পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিবেশ তাঁকে সঙ্গীত-চর্চায় উৎসাহিত করেছিল। ফলে তিনি পিয়ানো ও রবীন্দ্রসংগীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গমে' রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ অনুধাবন করতে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। শেষ বয়সে তিনি স্বামী প্রমথ চৌধুরী সহ শান্তি-নিকেতনে বাস করতেন। সেখানে বিশ্বভারতীর জন্য যখন প্রথম উপাচার্য পদ সৃষ্টি হয়, তিনিই সেই পদ অলংকৃত করেছিলেন। সুতরাং তিনিই ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা উপাচার্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। তাই 'ছিন্ন পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত। তা বাংলা পত্রসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্ভুক্ত একটি কবিতায় লিখেছিলেনঃ

সুন্দর মুখেতে তোর মগ্ন আছে ঘুমে
একখানি পবিত্র জীবন।
ফলুক সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে
আশীর্বাদ করো মা গ্রহণ।

এই আশীর্বাদ তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল, কারণ তিনি পুরুষের সহিত সমান অধিকার পেয়ে নিজের সুপ্ত গুণগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

নারীমুক্তি আন্দোলনে অন্যদের ভূমিকা

(১)

বাংলার নারী-উন্নয়ন আন্দোলন শতাধিক বৎসর ধরে চলেছিল। লর্ড হেস্‌টিংস-এর কাছে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে আবেদনের তারিখ ছিল ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ। তখন তার আরম্ভ। আইন-গত অধিকারের দিক থেকে তার পরিসমাপ্তি ঘটে স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দুকোড পাশ হওয়ায়। এখানে হিন্দুর একটি ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম এই সম্প্রদায়গুলিও হিন্দুর ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই সকল সম্প্রদায়ের নারীদের অধিকার আইনত এই কোডে স্বীকৃত হয়েছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আইনগত দিক হতে কোনও সমস্যা নাই। তবে মুসলমান সম্প্রদায় বাদ পড়ে গেছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ষণশীলতার মনোভাব এখনও প্রবলভাবে সক্রিয়। তাই সরকার জোর করে তাদের ওপর কোনও সামাজিক সংস্কার অরোপ করতে চান নি। এই সম্প্রদায়ের মধ্য হতেই এ বিষয় যখন ইচ্ছা প্রকট হয়ে উঠবে তখনই এই সম্প্রদায়ের নারীদের পূর্ণ সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার প্রশ্ন উঠবে।

আমরা দেখব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তি নারী-উন্নয়ন আন্দোলনকে নানাভাবে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। তাঁদের ভূমিকা রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মত বিরাট না হলেও নগণ্য ছিল না। আমরা দেখি ব্রাহ্মসমাজের দুই দিকপাল কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রীর এ আন্দোলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। আমরা দেখব দুর্গামোহন দাশ ও তাঁর দুই কন্যা সরলা রায় ও অবলা বসু এই আন্দোলনকে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক অবধি সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। আমরা দেখব স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভগিনী নিবেদিতা এদেশে এসে নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য দুটি শতাব্দীর সংযোগক্ষণে কি কঠোর সাধনা করেছিলেন। আমরা আরও দেখব স্বল্পভাষী, প্রচারবিমুখ, মৃদু স্বভাবের মানুষ হয়েও আচার্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নারীজাতির

কল্যাণ-সাধনে কিরূপ তন্ময় হয়ে কাজ করেছিলেন। বর্তমান ভাষণে এঁদের কীর্তি সম্বন্ধে একে একে পরিচয় দেওয়ার প্রস্তাব করি।

(২)

কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার এক বিখ্যাত বংশের সন্তান। অতি অল্পবয়সে তাঁর সমাজসংস্কারে তীব্র আগ্রহ ও অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি কাজেই কেশবচন্দ্রকে কাছে টেনে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম আচার্যরূপে নিয়োগ করেন। তুলনায় মহর্ষি ছিলেন রক্ষণপন্থী ; কিন্তু কেশবচন্দ্র ছিলেন বয়সে তরুণ এবং কঠোরভাবে সংস্কারপন্থী। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায়, কেশবচন্দ্র মহর্ষির গোষ্ঠীকে ত্যাগ করে একটি নূতন গোষ্ঠী স্থাপন করেন। তার নাম দেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। তা পরে 'নববিধান সমাজ' নামে পরিচিত হয় এবং মহর্ষির গোষ্ঠী 'আদিসমাজ' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কেশবচন্দ্রের নারীপ্রগতি সম্পর্কিত কাজ আদিসমাজের সহিত সংযুক্ত থাকার সময় হতেই সুরু হয়! সেকালে অবরোধপ্রথা এমন কঠোর ছিল যে স্বামীকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুর বাড়ীতেও যেতে দেওয়া হত না। কেশবচন্দ্র এই নিষেধ মানতে রাজী ছিলেন না। এই নিয়ে একটি ঘটনা ঘটে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে তিনি সস্ত্রীক এক বন্ধুর বাড়ী যেতে গেলে সমাজের রক্ষণশীল দলের থেকে বাধা পান। তখন তিনি কলুতলা থানায় তাদের বাধা হতে তাঁকে মুক্ত করতে আবেদন জানান। ঘটনাটি বর্তমান কালে পরিহাসের বিষয় গণিত হবে। কিন্তু তা দেখায় নারীর সামান্য অধিকার আদায় করে নিতেও সেকালে কি কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে হত।

এই সময়ই কেশবচন্দ্র অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি ব্যবস্থা করেছিলেন। তার তাৎপর্য গভীর। তৎকালীন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তিনি অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন। সেকালে মেয়েদের অল্পবয়সে একরকম নিরক্ষর অবস্থায় বিবাহ হয়ে যেত এবং তারপর শ্বশুরবাড়ীতে অন্তঃ-

পুরের অবরোধের মধ্যে বাস করতে হত। বেথুন বিদ্যালয়ে মুষ্টিমেয় উদারপন্থী পরিবারের মেয়েরা যেতে পারতেন। সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

অন্তঃপুরে এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৭৮৫ শকাব্দ চিহ্নিত সংখ্যায় (ইংরাজি ১৮৬৪) একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয়। তা হতে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়। তা হতে জানা যায় যে, যে প্রতিষ্ঠান এই শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল তার নাম ছিল ব্রাহ্মবন্ধু সভা। যাঁরা এ ব্যবস্থার সুযোগ নিতেন তাঁদের পাঠ্যের বিষয় জানিয়ে দেওয়া হত এবং কে কতখানি পাঠ সমাপ্ত করেছেন তার বিবরণ বছরে একবার চেয়ে পাঠানো হত। বছরে দুবার পরীক্ষা নেওয়া হত এবং যাঁরা সাফল্য লাভ করতেন তাঁদের পারিতোষিক দেওয়া হত।

নববিধান সমাজ স্থাপনের পর কেশবচন্দ্রের বড় কীর্তি হল মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপিত করা। ১৩ নং মির্জাপুর স্ট্রীটে এই বিদ্যালয়টি খোলা হয় ১।২।১৮৭১ তারিখে। বিদ্যালয়টি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে বর্তমানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় তথা কলেজের মর্যাদা পেয়েছে। তার যেমন ঘন ঘন নাম বদলেছে তেমন স্থানও বদলেছে। প্রথমে নাম পরিবর্তনের কথা বলি। প্রথম যখন স্থাপিত হয় তখন বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হয় 'ফিমেল নর্মাল এণ্ড এডাল্ট স্কুল'। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'ইনস্‌টিটিউশন ফর দি হায়ার এডুকেশন অফ নেটিভ লেডিজ'। পর বৎসরই তার নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় 'ভিক্‌টোরিয়া ইনস্‌টিটিউশন'। বর্তমানে সেই নামেই তা পরিচিত।

এই প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনও বহুবার হয়েছে। তা সূচিত করে কত ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুপ্রভা চৌধুরী যে বিবরণ দিয়েছেন, তা হতে দেখা যায় তার ভাগ্যে সাতবার স্থান পরিবর্তন ঘটেছিল। সেগুলির তালিকা দিয়ে শ্রোতাদের ধৈর্য পরীক্ষা করতে চাই না। শেষবারে তা বার বার স্থান পরিবর্তনের দুর্ভাগ্য হতে কেন মুক্তি পেল সেই কথা বলেই এই বিবরণ শেষ করব। কেশবচন্দ্র

নিজে আপার সার্কুলার রোডে যে গৃহ নির্মাণ করেন তার নাম দিয়েছিলেন 'কমল কুটীর' বা 'লিলি কটেজ'। তাঁর মৃত্যুর পর সে বাড়ী পরিবারের হস্তচ্যুত হয়। তখন কেশবচন্দ্রের কন্যা কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তা কিনে নিয়ে বিদ্যালয়কে দান করেন। ফলে বিদ্যালয়টি স্থায়ী বাসস্থান পায়।

কেশবচন্দ্রের নারীশিক্ষার পরিকল্পনায় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি শুধু বালিকাদের শিক্ষা দিতে চান নি, যে অগণিত বিবাহিতা অন্তঃপুরবাসিনী বয়স্কা মহিলারা ছিলেন, তাঁদের শিক্ষা দেবার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। সেটা তাঁর বিদ্যালয়ের প্রথম যে নামকরণ করেন, তা হতেই বোঝা যায়। এর নাম ছিল 'ফিমেল নর্মাল এণ্ড এডাল্ট স্কুল। এতে বালিকাদের যেমন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তেমন বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে নানা বিষয় তাঁদের বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা ছিল। উদ্দেশ্য, বয়স্কা মহিলারা সেই ভাষণগুলি শুনে তাঁদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে যখন বিদ্যালয়টি প্রথম স্থাপিত হয় তখন তাতে ২৪ জন অবিবাহিতা বালিকা ছাত্রী ছিল, ১৭ জন বিবাহিতা ছাত্রী ছিল, ৩ জন বিধবা ও ৪ জন কুমারী বয়স্কা ছাত্রী ছিল। ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্নী শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী।

শিবনাথ শাস্ত্রী একটি বিখ্যাত নাম। তিনি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে অবস্থিত মজিলপুর গ্রামের মানুষ। তাঁর জন্ম ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এণ্ট্রান্স ও এল এ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শাস্ত্রী উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।

ছাত্রাবস্থা হতেই তিনি প্রগতিপন্থী ছিলেন। সেই সময় তাঁর বন্ধু উপেন্দ্রনাথ দাসের সহিত এক বিধবা মহিলার বিবাহ দেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয় সহায়তা করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থা হতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও আকৃষ্ট হন। তিনি কেশব সেনের নূতন সমাজ স্থাপিত হবার পর তার প্রতি বেশী

আকৃষ্ট হন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করে উপবীত ত্যাগ করেন। পিতার আপত্তি ছিল; যখন পুত্র সে আপত্তি শুনলেন না, তখন তিনি পুত্রকে ত্যাগ করলেন। পুত্র একটি আদর্শ ধরে চলতেন এবং তার নির্দেশে যা করতেন, তা হতে কেহ তাঁকে বিচলিত করতে পারতেন না। একই কারণে তিনি কেশবচন্দ্রের আচরণে অসঙ্গতি দেখে তাঁর সমাজ ত্যাগ করে আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তোলেন। ঠিক বলতে কি তিনিই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং জীবনের শেষের অংশ এই সমাজগঠন ও তার প্রচারকার্যে নিয়োগ করেন। এমন আদর্শনিষ্ঠ মানুষ খুব কম দেখা যায়।

নারীজাতির উন্নয়নের প্রতি তাঁর অনুরাগের নানা ভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। তা তাঁর মূল লক্ষ্য না হলেও স্বাভাবিক মানবিকতাবোধ হেতু আনুসঙ্গিকভাবে এসে পড়েছিল। তার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের উপাসনা সভায় মহিলাদের পর্দার ভিতরে বসানো হবে কি না, এই নিয়ে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। তা দেখায়, এই সমাজের প্রগতিশীল পরিবেশ সত্ত্বেও পর্দাপ্রথা সহজে বিলুপ্ত হয় নি। সেইদিক হতে কাহিনীটির তাৎপর্য আছে।

প্রথমে ব্যবস্থা ছিল উপাসনা সভায় মহিলারা পর্দার আড়ালে বসবেন। যাঁরা প্রগতিশীল, তাঁদের মধ্যে দুর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ছিলেন। তাঁরা দাবী তুললেন, মহিলাদের পর্দার বাহিরে বসতে দিতে হবে। একদিন ত অন্নদাচরণ খাস্তগির ও দুর্গামোহন দাশ তাঁদের পরিবারের মেয়েদের নিয়ে পর্দার বাহিরে পুরুষদের সঙ্গে বসলেন। রক্ষণশীল দল ভীষণ আপত্তি করে বসলেন। তখন প্রগতিশীল দল সমাজে যাওয়া ত্যাগ করলেন এবং আলাদা উপাসনার ব্যবস্থা করলেন। সে উপাসনায় পর্দা থাকবে না। শিবনাথ শাস্ত্রী সেই উপাসনার আচার্য হলেন।

ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে দেখে কেশবচন্দ্র একটি আপোষের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন প্রগতিশীল দল ইচ্ছা করলে পর্দার বাহিরে বসতে পারবেন। তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের দল

স্বতন্ত্র সমাজ তুলে দিয়ে আবার কেশবচন্দ্রের সমাজে ফিরে এলেন। ব্যাপারটি দেখায়, ব্রাহ্মসমাজের মত প্রগতিশীল সমাজেও কত ধীরে ধীরে মহিলাদের অবরোধপ্রথার লোপ সংঘটিত হয়েছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রামে ডাক্তার প্রিয়নাথ রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মযুবকদের উপর তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ে। তাঁরা বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ করতে এবং বিদ্যালয় পরিচালনা করতে স্থানীয় জমিদার ও সমাজনেতার তীব্র বাধার সম্মুখীন হন। তা দেখায় গ্রামাঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষে কি গভীর প্রতিকূল মনোভাব সে কালে ছিল। সেই জন্য বিষয়টির একটি বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার প্রস্তাব করি।

বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকগণ একখণ্ড জমি কিনে তার উপর বাড়ী নির্মাণের জন্য সালতি করে খুঁটি, বেড়ার কাঠ ইত্যাদি আনলেন, কিন্তু জমিদারের নির্দেশে নির্মাণের স্থানে সেগুলি বয়ে নিয়ে যাবার জন্য মজুর পাওয়া গেল না। অগত্যা যুবকগণই তা বয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁরা ঘর নির্মাণের জন্য ঘরামি নিয়োগ করলেন; কিন্তু জমিদারের নির্দেশে ঘরামি কাজে হাত দিতে সাহস পেল না। তখন যুবকগণই ঘর তুলবেন ঠিক করলেন। এদিকে রাতারাতি জমিদারের প্ররোচনায় শুকুর মোল্লা নামে জমিদারের এক চাকর সেই জিনিসপত্র নিয়ে সেই জমিতেই ঘর তুলে দখল নিয়ে বসল। ব্রাহ্মযুবকেরা আদালতে নালিশ করায় তার জেল হয়ে গেল। জমিদার তাতেও হাল ছাড়লেন গ্রামের মানুষদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে নিষেধ করলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা কিন্তু সে নিষেধ মানেননি; তাঁর দুই কন্যাকে ভর্তি করলেন। দুজন ছাত্রী নিয়েই পড়ানো চলল।

১৮৮৮-র শেষে শিবনাথ বিলাত হতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সেখানে কিণ্ডারগার্টন রীতিতে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্মপাড়ায় ব্রাহ্মবালিকাদের শিক্ষার জন্য এই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সর্বনিম্ন শ্রেণীতে তিনি নিজেই কিণ্ডারগার্টন রীতিতে পড়ানোর ভার নিলেন। ক্রমে বিদ্যালয়টি

বড় হয়ে উঠল এবং কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করে প্রচলিত প্রথায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের তা মনঃপূত হয়নি। তাই তার সংস্রব তিনি ত্যাগ করলেন। এ বিষয় তাঁর নিজের মন্তব্য শোনা যেতে পারে। তিনি বলেছেন:

"ক্রমে শিক্ষালয়টি বড় হইয়া উঠিল। ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ইহাতে নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম এবং তদনুরূপ আয়োজন করিতেছিলাম। কিন্তু সমাজের সভ্যগণ ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং শ্রদ্ধেয় গুরুচরণ মহলানবিশের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বোর্ডিংকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া ইহাকে এক প্রসিদ্ধ বালিকা বোর্ডিং স্কুল করিয়া তুলিলেন। পরে আমি ইহার সহিত সাক্ষাৎ সংস্রব ত্যাগ করিলাম।"

(আত্মজীবনী, আবার দক্ষিণ ভারতে)

(৩)

নিজের দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেন এমন মানুষ অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এক অজানিত জাতির কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদন করার কাহিনী অতি বিরল। ভগিনী নিবেদিতা তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। জাতিতে তিনি ছিলেন আইরিশ; পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। তাঁর পূর্ব নাম ছিল মার্গারেট নোবেল। জীবনে তিনি নানা দুঃখ পেয়েছেন। পিতা অল্পবয়সে মারা গেছেন। যৌবনে তিনি যাঁর কাছে বাগ্‌দত্তা হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। মার্গারেট সাহিত্য চর্চা করেন এবং লণ্ডনের নিকটবর্তী মিসেস লিউ-এর বিদ্যালয়ে জীবিকার জন্য শিক্ষকতা করেন।

এমন অবস্থায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লেডি মার্জেসন-এর গৃহে বিবেকানন্দের সহিত তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। দেখেই তিনি মুগ্ধ। এই দৃপ্ত তেজস্বী সন্ন্যাসীর প্রতি এবং তাঁর প্রচারিত বেদান্ত দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ক্রমে পরিচয় হল। স্বামীজীও তাঁর গুণে প্রীত হলেন। কুমারী নোবেল-এর মধ্যে এমন গুণ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যার জন্য তিনি মার্গারেটকে

ভারতের অধঃপতিত নারীসমাজের উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করতে চাইলেন। তিনি সোজাসুজি মার্গারেটকে বললেন ঃ

"স্বদেশে নারীশিক্ষার একটি পরিকল্পনা করেছি। মনে হয় তোমার কাছ থেকে অনেক সাহায্যই পাব। হাজার হাজার মেয়ে ভারতবর্ষে অপেক্ষা করে আছে। তোমাদের দেশের কয়েকটি মেয়ে যদি সেখানে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একটু পথ বাৎলে দেয়, তবে তারাও বুঝি একটু মাথা তুলে সাড়া দিতে পারে।"

মার্গারেট তাতে সাড়া দিলেন। তখন স্বামীজী তাঁকে ভারতবর্ষ হতে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে এই কথাগুলি ছিল ঃ "তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকা, পবিত্রতা, বিপুল মানবপ্রেম ও সংকল্পের দৃঢ়তা নিয়ে তাদের সাহায্যের জন্য তুমি ভারতবর্ষে এস। তোমার মমতা ও ক্ষমতার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস।"

মার্গারেট ভারতবর্ষে এলেন। স্বামীজী তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তাঁর ভূমিকার উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার কোনও ত্রুটি রাখেননি। তিনি বলেছিলেন তাঁর চিন্তা, ভাবনা, প্রয়োজন —সবই হিন্দুভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। তাঁকে ভারতের সন্তান হতে হবে, ভারতবাসীকে আপনজন করে নিতে হবে। গুরুর উপদেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ২৫।৩।১৮৯৮ তারিখে স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত ক'রে নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। সার্থক নামকরণ। আত্মনিবেদনের এমন দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বোধ হয় নেই।

ভগিনী নিবেদিতা এদেশের মেয়েদের জন্য কি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য হতে। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি এই ঃ

"এই সতী নিবেদিতা দিনের পর দিন যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন তার কঠোরতা অসহ্য ছিল। ক্ষুদ্র অপরিসর ঘরে বাতাসের অভাবে কঠোর গ্রীষ্মের তাপে রাত্রির পর রাত্রি তাঁর ঘুম আসে নাই। দিনের পর দিন অর্দ্ধাশনে অনশনে আশৈশবের অভ্যাস ও সংস্কারকে সরাইয়া রাখিয়া যে হাসিমুখে ক্লেশবরণেও

তাঁর সহিষ্ণুতার ক্ষয় হয় নাই তা শুধু ভারতের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রীতির জন্যই। জীবের মধ্যে শিবের পূজায় তিনি রত ছিলেন।"

১৮৯৮-এর কালীপূজার শুভদিনে ১৭ নং বোসপাড়া লেনে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় খুললেন। তিনি একাই শিক্ষিকা। তেঁতুল বীচি নিয়ে গুণতে শেখাতেন, মাটি নিয়ে নানা জিনিষ তৈরী করতে শেখাতেন আর পড়াতেন। কিন্তু অর্থাভাব হল। আমাদের দুর্ভাগ্য, অর্থ দেশের মানুষের কাছ হতে এল না, বিদেশী সরকারের কাছ হতে তা পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং নিবেদিতা আমেরিকা গেলেন। সেখানে 'রামকৃষ্ণ সাহায্য সংস্থা' গঠিত হল। মিসেস ওলি বুল নামে এক বদান্য মহিলা হলেন সম্পাদিকা। এখান হতে সাহায্য এবং নিজের লিখিত বইয়ের রয়ালটি দিয়ে তিনি এবার বিদ্যালয় চালালেন।

এবার সঙ্গে আনলেন পারিবারিক পরিচালিকা বেটকে। ক্রিষ্টিন গ্রীনস্টাইন এলেন সহকারী শিক্ষিকারূপে। এবার বিদ্যালয় ভালভাবে চলল। বালিকাদের তিনি নিজে শিক্ষা দিতেন অঙ্ক, ইতিহাস ও চিত্রাঙ্কন। নিবেদিতার শিক্ষাপরিকল্পনা ব্যাপক ছিল। মেয়েদের অল্পবয়সে বিবাহ হয়ে যেত বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। বয়স্কাদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তিনি তাই অনুভব করেছিলেন। সুতরাং ১৬ নং বোসপাড়া লেনও ভাড়া নেওয়া হল। সেখানে বয়স্কা মহিলাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হল। তাঁদের জন্য কথকতা, রামায়ণ-মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা হল।

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষা সম্বন্ধে একটি নিজস্ব আদর্শ ছিল। তিনি শিক্ষার মধ্যে দুটি মূল বিষয়ের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব অরোপ করতেন। সে বিষয় তিনি তাঁর 'হিণ্টস অন এডুকেশন' নামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রথমত তিনি হৃদয়বৃত্তির পরিস্ফুরণের ওপর জোর দিয়েছেন। হৃদয়বৃত্তি পরিস্ফুট হলে ভাল কাজ করবার উচ্চ আদর্শকে রূপায়ণ করবার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, এই তাঁর ধারণা ছিল। যা হৃদয় দিয়ে চাইব তার জন্য যতখানি সাধনা করতে মন প্রস্তুত, যা সাধারণভাবে চাইব তার সম্পর্কে তত প্রস্তুত থাকে না। তাঁর

প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই ঃ

"শিক্ষার প্রথম কয়েক বৎসর এই কথা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে হৃদয়বৃত্তিকে পরিস্ফুট করবার মত প্রয়োজনীয় বিষয় আর কিছু থাকতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি গঠন অপেক্ষা উচ্চভাব অনুভব করা এবং উন্নত মন নিয়ে সৎভাবে কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারা হাজার গুণ বেশী প্রয়োজনীয়।"

দ্বিতীয় যে জিনিষটির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব অরোপ করেছিলেন তা হল শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "যে শিক্ষার সার্থকতা আছে, তার প্রথম কাজ হবে মুখ্যত চরিত্রকে গঠন করা এবং তারপর গৌণ ভাবে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনে নজর দেওয়া।

ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয় বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক অবধি জীবিত ছিল। তিনি নিজে ক্রমশ রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। তখন তাঁর সহকারিণী ক্রিষ্টিন গ্রীনস্টাইন-এর তত্ত্বাবধানে তা চলত। কিন্তু শেষে তিনি এই বিদ্যালয় ত্যাগ করে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। ভগিনী নিবেদিতা হতাশ হয়ে পড়লেন। তার অনতিকাল পরেই দার্জলিং-এ বেড়াতে গিয়ে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

(৪)

এবার আর একটি পরিবারের কথা উল্লেখ করা হবে যা নারী-উন্নয়ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে মহিলাদের দুর্দশা-মোচনের কাজে দেশকে অনেক কিছু দিয়েছিল। এই পরিবারের প্রধান হলেন দুর্গামোহন দাশ। তিনি যে পথ দেখিয়েছিলেন তার অনুসরণ করে তাঁর দুই কন্যা বিংশ শতাব্দীতে নারীপ্রগতি আন্দোলনে প্রচুর বলসঞ্চার করেছিলেন। প্রথমা কন্যার নাম সরলা। তাঁর সহিত আচার্য প্রসন্নকুমার রায়ের বিবাহ হয়। প্রসন্নকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ভারত সরকারের লণ্ডন আপিসে শিক্ষা-উপদেষ্টা হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন। দ্বিতীয়া কন্যা অবলার বিবাহ হয় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। জগদীশচন্দ্র স্বনামধন্য মানুষ। কাজেই তাঁর পরিচয়ের প্রয়োজন

নেই।

দুর্গামোহন দাশ ঢাকা জেলার তেলিবাগ গ্রামের বিখ্যাত দাশবংশের মানুষ। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বরিশালে ওকালতি করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর পিতা বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক হয়ে এক অল্পবয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করেন এবং কিছুকাল পরে তরুণী অবস্থায় তাঁকে রেখে মারা যান।

দুর্গামোহন প্রগতিবাদী ছিলেন। তিনি তাঁর বিধবা বিমাতার বিবাহ দেন। বিধবাবিবাহ তখন আইনসিদ্ধ হলেও জনমত তখনও তার বিপক্ষে ক্রিয়াশীল ছিল। বিশেষ করে মফঃস্বল অঞ্চলে এই প্রতিকূল মনোভাব অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। সুতরাং তার প্রতিক্রিয়া হল অত্যন্ত প্রতিকূল। স্থানীয় সমাজ তাঁকে একরকম একঘরে করে বসল। অগত্যা উপায় না দেখে তিনি বরিশাল ত্যাগ করে কলিকাতায় চলে এলেন। উকিল হিসাবে এখানেও তাঁর প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠল।

এখানে এসে তিনি কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। সে সময় তিনি সমাজের উপাসনা সভায় যে পর্দাপ্রথা ছিল, তার যে বিরোধিতা করেছিলেন; সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কলিকাতায় এসে তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ২২ নং বেনেপুকুর লেনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার নাম দেওয়া হয় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। এই বিদ্যালয়ের নাম পরে পরিবর্তিত করে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' রাখা হয়। এখানে তাঁর তিন কন্যা সরলা, অবলা ও শৈলবালাকে ভর্তি করে দেন। ব্রজকিশোর বসু তাঁর কন্যা কাদম্বিনীকেও এই বিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রহণ করতে সম্মত হয়। ফলে এন্ট্রান্স পরীক্ষার দরজা তাদের নিকট উন্মুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে এই বছর বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। পরের বছর বিধুমুখী এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। সরলা তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ডঃ প্রসন্নকুমার রায়ের সহিত বিবাহ হয়ে যাওয়ায় তাঁর ভাগ্যে আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটে নি।

দুর্গামোহন পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। বৃদ্ধ কুলীনের সহিত বিবাহের উদ্যোগ হলে তিনি বাধা

দিতেন এবং প্রয়োজন হলে বালিকাকে উদ্ধার করে আনতেন। এমন অনেক বালিকা দুর্গামোহনের আশ্রয়ে মানুষ হতেন।

একবার এই নিয়ে আদালতে মকদ্দমা হয়েছিল। বরদানাথ হালদারের ভাগিনেয়ী বিধুমুখীকে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ হবার সময় বিবাহসভা হতে উদ্ধার করে আনেন। ফলে বরদানাথ তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করেন। তখন দুর্গামোহন দাশ ও ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ আসামীদের সপক্ষে মকদ্দমা লড়েন। পরিশেষে তাঁরা খালাস পান। এর জন্য বিচারপতি আসামীপক্ষের আইনজীবীদের সুখ্যাতি করেন।

এহেন পিতার কন্যা ছিলেন সরলা রায় ও অবলা বসু। সুতরাং তাঁরাও যে পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নারীপ্রগতি আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। আমরা প্রথমে সরলা রায়ের কথা বলব।

সরলা রায় সুরুচিসম্পন্ন, ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট, উচ্চশিক্ষিত মহিলা ছিলেন। ফলে তাঁর বাড়ী একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। অনেক মনীষী তাঁর কাছে আসতেন। তিনি তাঁদের আপ্যায়ন করে, তাঁদের সহিত আলাপআলোচনা করে আনন্দ পেতেন এবং আনন্দ দিতেন। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল তাঁদের অন্যতম।

সরলা রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে নূতনত্ব ছিল। প্রথমত তিনি চেয়েছিলেন নারী-উন্নয়নের কাজে মহিলারা নিজেরাই এগিয়ে আসুন। তার জন্য তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমটি হল মহিলা সমিতি এবং দ্বিতীয়টি হল 'অল ইণ্ডিয়া উইমেনস কনফারেন্স', সংক্ষেপে 'এ আই ডব্লিউ সি'। তাঁর ধারণায় পুরুষরা মহিলাদের উন্নয়ন সাধনের জন্য অনেক করেছেন ; এখন হতে সে দায়িত্ব মহিলাদের নিজেদের নিতে হবে। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি তাঁর একটি প্রবন্ধে আছে ঃ

"পুরুষরা আমাদিগের জন্য অনেক করিয়াছেন, এখন অগ্রসর হইয়া অন্তত আমাদের সম্ভবনীয় ও করণীয় কার্যগুলির ভার না লইলে তাঁহাদের প্রকৃত সঙ্গিনী হইতে অথবা দেশের মঙ্গল কিছুই করিতে পারিব না।" (আমাদের দায়িত্ব)

দ্বিতীয়ত, কেবল সংকুচিত গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে মহিলাদের আবদ্ধ রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইতেন মহিলাদের সংসারের দায়িত্ব নিশ্চয় বহন করতে হবে, অতিরিক্তভাবে দেশের সেবাও করতে হবে। নিজেদের অক্ষমতার অজুহাত দিয়ে তা এড়িয়ে গেলে চলবে না। তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তিটি মহিলাসভায় প্রদত্ত একটি ভাষণে পাওয়া যায়। সেটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"আমরা কি কেবল অন্তঃপুরে প্রাচীরে বদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি? আমাদের ভিতরে কি কিছুমাত্রও পরোপকার করিবার বল শক্তি নাই? আমরা সকলে কেন একভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে এই নিরাশার কথা সকল সময় বলি, 'আমরা দুর্বল স্ত্রীলোক, আমরা আবার কাহার কি উপকার করিতে পারি?'।

বাড়ীতে সংসার দেখা যে মহিলাদের বিশেষ দায়িত্ব সে বিষয় তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাই দেখি, তিনি এ বিষয় বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে এবং ভাষণে। সংসার যে সমাজের ভিত্তিভূমি এবং নারী যে তার প্রাণকেন্দ্র এ কথাটির ওপর তিনি জোর দিতেন। তাই তিনি মহিলাদের ভাল গৃহিনী হবার উপদেশ দিতেন। এ আই ডব্লিউ সি-এর মাদ্রাজের অধিবেশনে সভানেত্রীর ভাষণে তিনি এই বলেছিলেন ঃ

"আমাদের ঘর-সংসারের প্রতি আমাদের সব থেকে বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারই হল সমাজের উপাদান। প্রায় সকল জাতিই এই ধারণা পোষণ করে যে মেয়েরা সমাজের প্রাণকেন্দ্র।"

মোটামুটি তাঁর আদর্শ ছিল মেয়েরা স্বাধীন পরিবেশে গড়ে উঠবে। তাদের জীবনের লক্ষ্য থাকবে দুটি। প্রথমত সুগৃহিণী হওয়া এবং অতিরিক্তভাবে দেশের সেবা করা। এই প্রসঙ্গে তিনি মহিলা সমিতির এক সভায় বলেছিলেন ঃ

"আসুন মহিলা সমিতিটাকে ভাল করে জাঁকিয়ে তুলে আমরা ঘরোয়া কথা নিয়ে আলোচনা করি—ভিতরের জীবন, সংসারের কাজকর্ম, দেশের জন্য, পাঁচজনের জন্য সমবেত কাজের যে উদ্দেশ্য সকলে হাত দিয়েই সেগুলো ভাল করে করি।"

সুতরাং এই আদর্শে মেয়েদের গড়ে তোলবার জন্য একটি মনের মত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। ভাগ্যক্রমে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে এই ভাবে। তাঁর বন্ধু গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতায় চাঁদা তোলা হয় এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকে, কিন্তু কোনও কাজ হয় না। কয়েক বছর অপেক্ষা করে তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহিলা সমিতির কাছে প্রস্তাব করলেন তাঁর স্মৃতিভাণ্ডারে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে তা দিয়ে কলিকাতায় তাঁর তাঁর নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হক। ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মত হলেন।

এরই ফলে ৮ই এপ্রিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুল স্থাপিত হল। শ্রীমতী সরলা রায় তার সম্পাদিকা হলেন। প্রথমে আনন্দ ব্যানার্জি লেনে একটি ভাড়া বাড়ীতে তা স্থাপিত হয়। পরে সরকারের কাছে প্রাপ্ত জমিতে তার নিজস্ব গৃহ নির্মাণ হলে সেখানে তা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে স্থানান্তরিত হয়।

শ্রীমতী রায়ের ইচ্ছা ছিল এই বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তার উদ্দেশ্য হবেঃ "শুধু সরকার পরিচালিত পরীক্ষাগুলিতে মুখস্থ করিয়ে ছাত্রীদের পাশ করানো নয়, অতিরিক্তভাবে তাদের চিন্তা ও আদর্শকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা এমন আদর্শ নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে যারা আদর্শ সংসার গড়ে তুলবে এবং বিবেকসম্পন্ন দেশসেবিকা হবার শক্তি রাখবে।" সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে পরীক্ষার জন্য যে পাঠের ব্যবস্থা আছে তার অতিরিক্তভাবে গৃহবিজ্ঞান, শিশুপালন বিদ্যা, সেলাই-এর কাজ, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প-শিক্ষণেরও ব্যবস্থা রেখেছিলেন।

সরলা রায়ের ছোট বোন অবলা বসুর মহিলাদের উন্নয়নের চেষ্টায় ভূমিকা কিছু কম ছিল না। তিনি যেমন স্ত্রীশিক্ষায় জোর দিয়েছিলেন তেমন দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং আর্থিক দিক হতে স্বাবলম্বিনী হবার প্রতি সমান দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী। প্রথমত বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়

স্থাপন করতে হবে। অতিরিক্ত উদ্দেশ্য ছিল কুটীরশিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং তাকে সম্ভব করতে কুটীরশিল্প শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলাদের মধ্যে এই ধরণের শিক্ষা যাতে মহিলারাই দিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হবে।

এই উদ্দেশ্যে পরবর্তী কালে শ্রীমতী অবলা বসু অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মহিলা শিল্পভবন স্থাপিত হয়। এখানে মহিলারাই কুটীরশিল্প গড়ে তুললেন, এই উদ্দেশ্য ছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্থাপিত হয়। এটিকে শিক্ষিকা-শিক্ষণ কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মহিলাদের শিক্ষার জন্য বাণীভবন শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্বাধীনতালাভের পর তার একটি শাখা ঝাড়গ্রামে স্থাপিত হয়। তার সঙ্গে প্রাক্‌বুনিয়াদী শিশু বিদ্যালয় ও নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সংযুক্ত হয়।

বসু-দম্পতীর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার খুব ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে এক প্রদর্শনীতে। তার ফলে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তা ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুদিবস পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় সজীব ছিল। প্যারিস প্রদর্শনীর পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। তখন ভগিনী নিবেদিতা তাঁর যে সেবা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। ফলে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এমন গভীর হয় যে, আচার্য জগদীশচন্দ্রকে নিবেদিতা 'খোকা' বলে ডাকতেন এবং শ্রীমতী অবলা বসুকে ডাকতেন 'বৌ' বলে। অবশ্য তাঁর মেমসাহেবের মুখে তা পরিস্ফুটভাবে উচ্চারিত হত না, হত 'বো' বলে। ভগিনী নিবেদিতার দার্জিলিং-এ যখন মৃত্যু হয়, তিনি বসু-দম্পতীরই অতিথি ছিলেন।

সুতরাং অবলা বসুর কাছে নিবেদিতা একটি প্রিয় নাম। তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে অবলা বসু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে একটি ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করেন। উদ্দেশ্য, এই ভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থ হতে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। এই শিক্ষণের অঙ্গ ছিল প্রাথমিক মান পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা-বিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, কুটীরশিল্প শিক্ষণ এবং সব্‌জী বাগান শিক্ষণ। বোঝা যায়, বয়স্কা মহিলাদের

এমনভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল যাতে বিদ্যাচর্চা, সমাজসেবা এবং আর্থিক স্বাবলম্বিতা সবগুলিই একসঙ্গে আয়ত্ত করা যায়।

(৫)

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৫ খৃষ্টব্দে চব্বিশ পরগণার হাবড়া থানার অন্তর্ভুক্ত খাঁটুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের পূর্বপুরুষ সকলেই উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতা ধরণীধর শিরোমণি সেকালের শ্রেষ্ঠ কথক বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর খুল্লতাত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রথম বিধবাবিবাহ করে সমাজ সংস্কারের পথে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মুরলীধরের মাত্র দশ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। তিনি তারপর কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজের সহিত সংযুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করলে সংস্কৃত কলেজ তাঁকে "বিদ্যারত্ন" উপাধি দেন। পরবৎসর তিনি কটকের র‍্যাভন শ কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান হতে তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে বদলী হন এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে ১৯৩২ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। অবসর সময়ে তিনি সমাজসেবা করতেন।

মুরলীধর প্রচারবিমুখ স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। তাঁর বন্ধুরা তাই এই বলে উপহাস করতেন যে, তাঁর কথক পিতা সব কথাই বলে গেছেন বলে তিনি আর কথা বলেন না। এ হেন নিরুপদ্রব মানুষ যে প্রয়োজন হলে সমাজসংস্কার আন্দোলনে রীতিমত জড়িয়ে পড়তে পারেন তা ছিল কল্পনাতীত। কিন্তু তা-ই ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার অধ্যাপক অমলেন্দু দে বলেছেন ঃ

"তাঁর মধ্যে যে একটি সজীব সমাজ-সচেতন মানুষ রয়েছে তার পরিচয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে অনেকেই পান নি। সংস্কৃত পরিবেশে মানুষ হয়েও, সংস্কৃত শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করেও মুরলীধর প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতি উদাসীন ছিলেন না।"

যে ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তাঁর সমাজ সংস্কারকের ভূমিকার সূত্রপাত হয় তা হল ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভি জি প্যাটেল উত্থাপিত ভারতীয় আইনসভায় হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণবিবাহ সমর্থনের আইনের প্রস্তাব।* এই বিল উত্থাপিত হলে দেশে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৮ জন মহারাজা, ২২ জন রাজা, ৬ জন নাইট, ১৩ জন মহামহোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে সরকারের নিকট আবেদন করেন। যাঁরা এই প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মদনমোহন মালব্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক।

যিনি কথা বলতেন না তিনি এই প্রতিবাদের বহর দেখে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন। কারণ, তাঁর বিবেচনায় 'মন্ত্র ও উপনিষদাত্মক শ্রুতি যে ধর্মের মূল, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যাহার শাখা, গীতা, পুরাণ ও তন্ত্রে যাহার সমন্বয় তাহা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নহে।' তিনি এই প্রতিবাদের অযৌক্তিকতা খণ্ডন করে এবং বিলের সমর্থনে যুক্তি দেখিয়ে 'সঞ্জীবনী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য হল জাতিভেদ-প্রথা সংকীর্ণ মনোবৃত্তি-প্রণোদিত। সুতরাং প্যাটেল বিল অভিনন্দনযোগ্য। 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত তাঁর এই মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ

"এখন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে এই সমস্ত সংকীর্ণ প্রথা পরিবর্তিত করিতে হইবে। যাঁহারা বর্তমান যুগের অনুরূপ করিবার নিমিত্ত হিন্দুসমাজকে উন্নতিশীল করিতে চান, তাঁহাদিগকে কঠোর নিয়মের দ্বারা সমাজ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া ইহারই মধ্যে স্থান দিতে হইবে।"

তিনি এই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেন, "পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপরই রাজনৈতিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। পারিবারিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভের যাঁরা বিরোধী, রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভের জন্য কোলাহল করা কেবল তাঁহাদের ছলনা মাত্র।"

তাঁর মধ্যে একজন শক্তিমান প্রবক্তা আবিষ্কার করে দেশের প্রগতিশীল কিছু মানুষ তাঁকে কেন্দ্র করে এক সংগঠন গড়ে তোলেন।

---

* Hindu Marriage Validity Bill

তার নাম দেওয়া হয় 'বঙ্গীয় সমাজসংস্কার সমিতি।' তিনি তার সভাপতি নির্বাচিত হন। তারই উদ্যোগে বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যা আলোচনার জন্য এক সভা আহ্বান করা হয় ৪ঠা এপ্রিল ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। এই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সামাজিক সভা'র অধিবেশন হয় মেদিনীপুরে তাঁকে সভাপতি করে। তাতে তিনি যে অভিভাষণ দেন তার মধ্যে একটি উদার সংগঠনমূলক সুর ধ্বনিত ছিল।

তার প্রতিক্রিয়া হয় বিচিত্র। একদিকে রক্ষণপন্থী দল তাঁর তীব্র সমালোচনা করে। 'নায়কে'র সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেদিনীপুরে মুরলীধ্বনি' নামে ধারাবাহিক সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁকে নিয়ে পরিহাস করেন। অপরদিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তার জন্য তাঁর সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন, "পণ্ডিত মহোদয়ের সহৃদয়তা, সত্যনিষ্ঠা ও সৎসাহস অতীব প্রশংসনীয়।" (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

তাঁর ভাষণে মুরলীধর সমাজসংস্কার বিষয়টির মূলে রয়েছে 'স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অবস্থাগত বৈষম্য'। তিনি বলেছেন, সমাজ দুটি পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একটি যদি পুরুষ হয়, অপরটি হয় নারী। এখন একটি পা যদি পঙ্গু করে রাখা হয়, মানুষ চলতে পারে না। হিন্দুসমাজের সেই দশা হয়েছিল। মেয়েদের নানা শাসনে নিগড়ে বেঁধে, অন্তঃপুরের দাসী বানিয়ে আমরা আমরা সমাজের একটি পা-কে পঙ্গু করে ফেলেছি। সেই পা-টি সুস্থ না হলে আমরা খুঁড়িয়ে চলব।

এই কারণে তিনি নারীপ্রগতি নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেন। এই উদ্দেশ্যে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়াতেই তিনি 'নারীসত্বুন্নতি সমিতি' স্থাপন করেন। তার কাজ বিধবাবিবাহে, অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দেওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

যেখানে বিধবাবিবাহ দিতে বা অসবর্ণ বিবাহ দিতে পুরোহিত পাওয়া যেত না, সেখানে মুরলীধর নিজেই পুরোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে মতিলাল রায় তাঁর

প্রবর্তক সংঘের আশ্রমে একটি অসবর্ণ বিবাহ দিতে তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ সংখ্যায় দেখা যায় তিনি একটি বিধবার বিবাহ নিজে দিয়েছেন বলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সৎসাহসের প্রশংসা করেছেন।

নারীসমুন্নতি সমিতির পরিকল্পনা অনুসারেই মুরলীধর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে কয়েক বছর উপযুক্ত জায়গার অভাবে তাঁর ১৮।১ নং ফার্ণ রোডের বাগানবাড়ীতে তা অবস্থিত ছিল। তারপর নানা জায়গা ঘুরে ৪ নং হিন্দুস্থান রোডে স্থায়ী ভাবে বসতে থাকে। তিনি আমরণ তার সম্পাদকের কাজ করে গেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ধীরে ধীরে তা বালিকা বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তা মহাবিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরে মহাবিদ্যালয় স্বতন্ত্র নিজস্ব গৃহে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তিত করে মুরলীধরের নামের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ দক্ষিণ কলিকাতার প্রাচীনতম বালিকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

তারপর বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠার পর পরিস্থিতি একেবারে বদলে গেল। একটি বড় বন্যার প্লাবন এলে যেমন সব অবর্জনা তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমন স্বাধীনতা আন্দোলন এমন সর্বাত্মক হয়ে উঠল যে মেয়েরাও বিনা বাধায় তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারল। মদের দোকানে পিকেট করতে মেয়েরা এগিয়ে এল, শোভাযাত্রায় মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলল। স্বাধীনতা যুদ্ধে—কি অহিংস রীতিতে, কি সহিংস রীতিতে—মেয়েরা কোথাও পিছিয়ে থাকেনি। সহিংস রীতিতে যেমন প্রীতিলতা ওয়াদেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী ছিলেন, অহিংস পথের সংগ্রামে তেমন অগণিত স্বাধীনতা-যোদ্ধা ছিলেন। অহিংস যুদ্ধে মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ফলে পর্দা আপনি ভেঙ্গে গেল, নারী-স্বাধীনতা আপনি প্রতিষ্ঠিত হল, বিধবা-বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে কুসংস্কার

কোথায় ভেসে গেল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের আগে মহাত্মা গান্ধী ভাবী ভারতের যে মূর্তি কল্পনা করেছিলেন, তাতে নানা ইচ্ছার মধ্যে এই ইচ্ছাটি উচ্চারিত হয়েছিল যে তাঁর স্বপ্নের ভারতে পুরুষজাতি যেসকল অধিকার ভোগ করে, নারীজাতিও সেগুলি ভোগ করবে।* তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতবাসী এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছিল। ভারতের সংবিধান এবং হিন্দুকোড কেবল তাকে বিধিবদ্ধ রূপ দিয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীমুক্তি আন্দোলনের বাংলার বাহিরে বিস্তার

(১)

উনবিংশ শতাব্দীর সোত্তরের দশকে নারীমুক্তি আন্দোলন বাংলার বাহিরে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে বাংলার বাহিরে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে কয়েক জন প্রগতিশীল উদার মহিলা ও পুরুষ সমাজকর্মীর নেতৃত্বে তা একটি প্রবল অন্দোলনের রূপ নেয়। তাঁদের চেষ্টায় নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হয় এবং সমাজ হতে স্থলিত দুর্ভাগ্য মেয়েদের উদ্ধার করে আশ্রয় দেবার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

এঁদের মধ্যে যিনি নিজগুণে পুরোভাগে নিজেকে স্থাপিত করেন তাঁর নাম পণ্ডিত রমাবাই (১৮৫৮-১৯২২); তিনি এক সম্ভ্রান্ত মারাঠা পরিবারের সন্তান। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অল্প বয়সে বিধবা হবার পর খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে গিয়ে কিছুকাল বাস করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি কতকগুলি নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

মহিলাদের শিক্ষণের জন্য তাঁর স্থাপিত এমন একটি প্রতিষ্ঠান

* 'The women will enjoy the same rights as men.'

হল বোম্বাই সহরে অবস্থিত সারদা সদন। এই বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষালাভ করেন তাঁদের মধ্যে সড়ু বাই নামে এক বিধবা মহিলা অন্যতম। তিনি আমন্দী বাই নামেও পরিচিত। পরবর্তী কালে তাঁর সহিত ধণ্ডে কেশবে কার্ভের পরিচয় ও বিবাহ হয়। ইনি সমাজসেবা করে মহর্ষি কার্ভে নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এই দম্পতি নারী জাতির কল্যাণে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

পণ্ডিতা রমাবাই স্থাপিত অপর একটি প্রতিষ্ঠানের নাম মুক্তিসদন। এখানে সমাজবিরোধী পরিবেশ হতে মুক্ত করে উদ্ধার-প্রাপ্ত নারীদের আশ্রয় দিয়ে শিক্ষিত করে নূতন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা ছিল।

নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা নিয়েছিলেন এমন আর একটি মহিলার নামে রমাবাই রানাডে (১৮৬০—১৯২৪)। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি এক প্রকাশ্য সভায় ইংরাজীতে ভাষণ দিয়ে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তারিখটি ছিল ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

তিনি পুণা সেবাসদন নামে একটি নারীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তা এত প্রতিপত্তি লাভ করে যে পরে তার বহু শাখা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়। তাঁর স্থাপিত আরও দুটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হল সেবাসদন নার্সিং হোম এবং মেডিক্যাল এসোসিয়েশন ফর উইমেন। দুটিই ছিল শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এখানে পীড়িতদের সেবা করবার জন্য নার্সিং শিক্ষা দেওয়া হত।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী আনন্দী বাই যোশীর নামও উল্লেখযোগ্য। তিনিই ভারতে প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারিখটি ছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। এইভাবে তিনি বাংলার মেয়ে বিধুমুখী বসুর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার অনুসরণ করেছিলেন।

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে যিনি নারীমুক্তি আন্দোলনে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি ধণ্ডে কেশবে কার্ভে

(১৮৫৮—১৯৬২) তিনি নারী জাতির মধ্যে শিক্ষাপ্রসার এবং সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে তাদের মুক্তির অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিলেন। এই মহৎ কীর্তির জন্য তিনি সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী হিসাবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে স্বীকৃত। নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম অগ্রণী পণ্ডিতা রমাবাই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তিনি অপর বিখ্যাত নারী নেত্রী গড়ু বাইকে বিবাহ করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি কার্ভে 'উইডো-রি-ম্যারেজ এসোসিয়েশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান বিধবাদের বিবাহ জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হিঙ্গেতে 'অনাথ বালিকা আশ্রম' স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য, যে সকল বালিকাদের ভরণ-পোষণ করবার কেহ নাই তাদের সেখানে আশ্রয় দেওয়া। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুণাতে 'মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন।

তাঁর সব থেকে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল পুণাতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন। সে বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল মহিলাদের শিক্ষণের জন্য সারা ভারতে তাই একমাত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়। তার প্রাথমিক ব্যয় ভার প্রায় সমস্তই বহন করেছিলেন স্যার ভিখল দাস থ্যাকারসে। তাঁর মায়ের নামেই এই বিশ্ববিদ্যালয় চিহ্নিত। মহর্ষি কার্ভে নিজেই অধ্যক্ষ পদের প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(২)

বিংশ শতাব্দীর সুরুতে নারীমুক্তি আন্দোলন এমন শক্তি সঞ্চয় করে যে তা আর ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে থাকেনি। তাই দেখি এই বিশেষ উদ্দেশ্যে নিবেদিত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং তাদের মধ্যে সংগঠিত ভাবে একটি ব্যাপকতর আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই নূতন পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কলিকাতার বেথুন কলেজে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একটি সভা ডাকা হয়। এই সভার উদ্বোধন করেন বরোদার মহারাণী। ভারতের বিভিন্ন তরফ ও মিত্ররাজ্যের মহারাণীরা এই সভায় যোগ দেন। দুই বছর পরে ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে প্রথম মহিলা জাতীয়

মহাসভা আহ্বান করা হয়। বিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্যর শঙ্করন নায়ার এই সভায় নেতৃত্ব করেন। তাতে সরোজিনী নাইডু বিধবাদের পুনর্বিবাহে উৎসাহ দেবার সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

নারীমুক্তি আন্দোলনে পরিচালিত করবার জন্য প্রথম যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে তার জন্ম হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। এ বিষয় তিনি অগ্রনীর ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি একজন আইরিশ মহিলা, নাম মার্গারেট ই কাজিনস। এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় উইমেনস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। তার উদ্দেশ্য ছিল নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা।

অনুরূপ উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স' কনফারেন্স নামে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে। পরে এই প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই নূতন প্রতিষ্ঠানটির প্রথম অধিবেশন হয় পুণাতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। শ্রীমতী সরলা রায়ের নেতৃত্বে তা যে বিশেষ প্রাণবান হয়ে ওঠে তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

একই উদ্দেশ্যে এই সময় 'সরোজিনী দত্ত মহিলা সমিতি' এবং 'ভারত স্ত্রী মণ্ডল' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত হয়। প্রথমটি গুরুসদয় দত্ত তাঁর অকাল প্রয়াত পত্নী সরোজনলিনীর স্মৃতি রক্ষার জন্য স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি মহিলাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে নানা ভাবে ব্যবস্থা করে সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

(৩)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনে পরোক্ষ ভাবে দুর্জয় প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর ভারতবাসীর হাতে ভারতের শাসনভার ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হবে সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে নূতন ভারত রক্ষা আইন পাশ করেন তাতে নামে মাত্র ভারতবাসীর

হাতে প্রশাসনিক দায়িত্ব তুলে দেওয়া হত। কেবল প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বায়ত্বশাসনের মত কতকগুলি গৌণ দায়িত্বের ভার জনপ্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া হত। ফলে যে অসন্তোষ দেখা দেবার আশঙ্কা ছিল তাকে দমনের উদ্দেশ্যে কুখ্যাত 'রাওলেট এক্ট' পাশ হয়। তাতে বিনা বিচারে যে কোনও ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করবার অধিকার সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। ফলে এই আইনের বিরুদ্ধেই ভারত জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবে তা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে স্থানীয় ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী তাকে নৃশংস ভাবে দমন করবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার ফলে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে অস্ত্রহীন জনতাকে গুলি করে হত্যার বীভৎস নাটক অভিনীত হয় তা ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনা। তখন মহাত্মা গান্ধী এসে ব্রিটিশ পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে ভারতবাসীর মুক্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করেন।

ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে এই ঘটনা একটি নূতন অধ্যায় প্রবর্তন করে যার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। তা শুধু আন্দোলনকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেয় না, তা জনগণকেও জাগিয়ে তুলে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনে। যা ছিল কিছু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ আন্দোলন তা গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলন কয়েক বছর পরে পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু তার আগে তার মধ্যে এক সর্বাত্মক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে মানুষ অহিংসার পথ বর্জন করে হিংসার পথে স্বাধীনতা আদায়কে ব্যাপক আকারে প্রয়োগ করে। হিংসার পথ চিরদিনই ক্ষীণধারায় প্রবাহিত ছিল। তবে এবার যেন প্রবলধারায় প্রবাহিত হয়। বিশেষ করে বাংলা দেশে তা বহুসংখ্যক আত্মত্যাগে উৎসুক তরুণদের আকর্ষণ করে। মেদিনীপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে তা ব্যাপক সন্ত্রাসবাদের আকার গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন এমন সর্বাত্মক ছিল যে মহিলারাও তাতে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়েন। এই সন্ত্রাসভিত্তিক আন্দোলনেও তাঁরা যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে

তার কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে অনেক তরুণ-তরুণী এই জীবনপণ সংগ্রামে যোগ দেন। তাঁর অনুগামিনী তরুণ মহিলাদের কিছু আত্মোৎসর্গ ও দুঃসাহসিকতার উদাহরণ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে।

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সূর্য সেন ধলঘাটে সবিতা দেবীর বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিলেন। গুপ্তচরের কাছ হতে সন্ধান পেয়ে ১৪ই জুলাই ১৯৩২ তারিখের রাতে ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের নেতৃত্বে একটি পুলিশবাহিনী সেই বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। সূর্য্য সেন তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দুই তরুণী সহকারিণী সহ সেই ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যান। ক্যাপ্টেন ক্যামেরন গুলির আঘাতে নিহত হন। এই দুই তরণী হলেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদেকার।

তার মাত্র কয়েক মাস আগে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কুমিল্লার জেলাশাসক সি. জি বি ষ্টীভনস-এর আবাস গৃহে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের দুটি ছাত্রী তাঁর সহিত দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁদের কাছে উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কাপড়ে লুকান রিভলভার বার করে এক সঙ্গে তাঁরা গুলি ছোঁড়েন ফলে ষ্টীভনস-এর তখনই মৃত্যু ঘটে। এই দুই বালিকার নাম শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। তাঁরা নিতান্তই বালিকা বয়সী ছিলেন বলে তাঁদের যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ড দেওয়া হয়। এই ভাবে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মৃত্যুপণ করে বিদেশী শাসক শ্রেণীর মানুষকে আক্রমণের কাজে নিতান্ত বালিকা বয়সী কিশোরীদের ব্রতী হবার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। তা দেখায় দেশের মানুষের মুক্তিস্পৃহা এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়েছিল।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায়। বাংলার গভর্নর স্যার জন এণ্ডারসন তখন পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত। সভার মধ্যে বীণা দাস নামে এক ছাত্রী তাঁকে লক্ষ্য করে রিভলভার ছুঁড়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে রিভলভার হতে

নির্গত গুলি আচার্যের যুকপকেটে রাখা একটি নোটবুকে লেগে প্রতিহত হয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফলে ঘটনাটির পরিণতি বিয়োগান্তক হয় নি।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস নির্দেশ মত তাঁর দ্বিতীয় আন্দোলন স্থরু করেন। এবার কংগ্রেস ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাকে লক্ষ্য বলে দেশবাসীর নিকট স্থাপন করেন। এই সূত্রেই মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন লবণ উৎপাদন করে আইন ভঙ্গের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক দণ্ডী অভিযান দিয়ে আরম্ভ হয়। তা অনতিবিলম্বে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মাদক দ্রব্যের দোকান ব্রিটিশদের উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যের দোকান এবং সভা ও শোভাযাত্রা এই আন্দোলনের অঙ্গ ছিল। তাতে সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষ নারী-পুরুষ, তরুন-প্রবীন নির্বিশেষে পরম উৎসাহে যোগ দিয়েছিল। বিদেশী সরকারের তাকে দমনের সকল চেষ্টা তাকে খর্ব করতে পারে নি। আইন ভঙ্গ করার অপরাধে সহস্র সহস্র লোকের কারাদণ্ড হয়েছিল। এতে মহিলারা কত ব্যাপক হারে যোগ দিয়ে ছিলেন তার একটি তথ্য সুন্দর পরিচয় দেয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে যত মানুষ দণ্ডিত হয়েছিল তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল স'তের হাজার।*

মহাত্মা গান্ধী যখন লবণ উৎপাদন করে আইন ভঙ্গ করবার জন্য দণ্ডী অভিযান স্থরু করেন, মহিলারা ক্রমবর্দ্ধমান হারে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী সরকারের হাতে বন্দী হবার আশঙ্কায় আগে হতেই তাঁর অনুপস্থিতিতে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেবার জন্য আব্বাস তৈয়বজী ও সরোজিনী নাইডুকে ক্রমিক পর্যায়ে নেতৃত্ব গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তৈয়বজীকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করবার পর যখন সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বের পালা এল তাঁর দলে অধিকতর সংখ্যায় নারী সত্যাগ্রহী অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝপথে ধর্ষনাতে ব্রিটিশ বাহিনী এই অভিযানের পথরোধ করে বসে এবং সরোজিনী নাইডুকে কারারুদ্ধ করা হয়।

এই সময় এলাহাবাদের নেহেরু পরিবারের মহিলারা এই

* Womenn of India, Padmini Sengupta Chap. XXVIII.

আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই পরিবারের মাতা, কন্যা, বধূ সকলেই এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং ফলে নানা ভাবে নির্যাতিত হন। ১৯৩২ এর এপ্রিল জহওরলালের বৃদ্ধা মাতা স্বরূপরাণী নেহরু একটি শোভাযাত্রায় যোগ দেন। পথে পুলিশ অবরোধ করলে তাঁকে বিশ্রামের জন্য বসতে একটি চেয়ার দেওয়া হয়। তিনি সেই চেয়ারে বসতে গেলে পুলিশ তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। পড়ে গিয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। একই বছরে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার অপরাধে এই পরিবারের দুই কন্যা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং কৃষ্ণার বিচার হয় এবং তাঁদের প্রত্যেকের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। একই অপরাধে এই পরিবারের বধূ কমলা নেহেরুর দুই মাসের কারাদণ্ড হয়।

তৃতীয় দফায় মহাত্মা গান্ধী যখন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখন ব্রিটিশ সরকারের আদেশে সকল কংগ্রেস নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। তবু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নেতৃহীন জনগণ আন্দোলন চালিয়ে যান। জনগণের এই প্রতিবাদ দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হিংসাত্মক পথে যাঁরা যান তাঁদের ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে দমন করেন। যাঁরা মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণে অহিংসার পথে প্রতিবাদ করেন, তাদের প্রতিও সরকার সমান কঠোর রীতি প্রয়োগ করেন এবং অমানুসিক আচরণ করেন। এই পথের যাঁরা পথিক হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এক মহিলা চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করে অহিংসানীতির আদর্শে শহিদ হয়ে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যান। ইনি হলেন তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। তিনি তমলুকে এক শোভাযাত্রায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে যখন কংগ্রেস পতাকা হাতে ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ব্রিটীশ সৈন্য তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। যখন তাঁর প্রাণহীন দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল তখন দেখা গেল তখন দেখা গেল সেই ত্রিবর্ণ খচিত পতাকা ধারী হাতের মুঠি কিছু মাত্র শিথিল হয় নি। এই চূড়ান্ত বীরত্বের দৃষ্টান্ত জাতির ইতিহাসের সেই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে এই প্রবীন মহিলা অহিংস পথে আত্মত্যাগের এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন।

এই ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের ব্যাপক হারে যোগ দেবার ফলে ভারতের সমাজব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সুরু হয়েছিল। তা যেন এক বিরাট প্লাবনের মত দেশের সমাজকে ভাসিয়ে দিয়ে সমাজদেহ হতে নানা আবর্জনা স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অনেক পরিমাণ দোষমুক্ত করতে সহায়তা করল। মানুষের মন হতে নারী জাতির প্রতিকূল নানা যুক্তিহীন সংস্কার মুছে নিয়ে গিয়েছিল।

নারী জাতির প্রতি বিরূপ মনোভাবের এইভাবে আমূল উৎপাটিত হবার ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনকে সফল পরিণতির পথে দ্রুত এগিয়ে দিয়েছিল। প্রথমত, মহিলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলে পর্দাপ্রথার একেবারে বিলোপ সংঘটিত হয়েছিল। নারীর কর্মক্ষেত্র অন্দর মহলে সীমাবদ্ধ না থেকে বাহিরের জগতে প্রসারিত হল। নারীজাতির সহিত পুরুষের সকল ক্ষেত্রে অবাধ সাহচর্যের ফলে জাতিভেদ প্রথা যে সংস্কারের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে-ছিল তার ভিত্তি শিথিল হয়ে গেল। অসবর্ণ বিবাহ বেশ প্রসারলাভ করল। নারী জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহসিকতা এবং চূড়ান্ত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত নারীকে যেমন তার সুপ্ত শক্তির বিষয় সচেতন করে তুলল, তেমন পুরুষ জাতির মনে তার প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হল। ফলে ভারতের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে পুরুষ শাসিত সমাজে ভারতের নারীকে তার ন্যায়সঙ্গত যে অধিকার হতে এতকাল বঞ্চিত রাখা হয়েছিল তাতে তাকে পুনরধিষ্ঠিত করবার প্রয়োজনবোধ দেশের মানুষের মনে প্রবল হয়ে উঠল।

ভারতের মানুষের মনের এই নূতন চিন্তার সুন্দর অভিব্যক্তি মিলবে মহাত্মা গান্ধী লণ্ডনে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকের অব্যবহিত পূর্বে বিখ্যাত সংবাদ পরিবহন সংস্থা রয়টারের প্রতিনিধির কাছে যে মন্তব্য রেখেছিলেন তার মধ্যে। সেই মন্তব্যের বাংলা অনুবাদ এই রকম দাঁড়ায়ঃ

"আমি এমন একটি সংবিধান গড়বার জন্য চেষ্টা করব যা অপরের দাসত্বের ও করুণার পাত্র হবার কলঙ্ক হতে ভারতকে মুক্ত

করবে এবং তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা, এমন কি পাপ করবার ক্ষমতারও অধিকার দেবে। আমি এমন এক ভারত গড়ে তুলব যেখানে দরিদ্রতম মানুষও ভাবতে পারবে যে এদেশ তাদের দেশ, এবং তাকে গড়ে তোলবার তাদের অধিকার সংরক্ষিত হবে, যেখানে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী বলে কিছু থাকবে না, যেখানে সকল সম্প্রদায় প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকবে। সেই ভারত হতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ নির্বাসিত হবে এবং মাদক পানীয় বা দ্রব্য সেবন বর্জিত হবে। সেখানে নারীজাতি পুরুষের সহিত সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এখানে লক্ষণীয় যে মহাত্মা গান্ধী যে নূতন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন তার মধ্যে নারী জাতির অধিকারের চিন্তা রীতিমত অগ্রাধিকার পেয়েছিল। এখানে তাঁর মুখে যেন সকল প্রগতিশীল ভারতবাসীর মনের ইচ্ছা উচ্চারিত হয়েছিল। সুতরাং ভারতের পরাধীনতা হতে মুক্তির অব্যবহিত পরে তাঁর অনুগামীরা নূতন ভারত গড়বার উদ্দেশ্যে যে সংবিধান রচনা করলেন তাতে মহাত্মা গান্ধীর উপরে বর্ণিত আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছিল। ফলে এমন এক সংবিধান রচিত হয়েছিল যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যেমন ব্যক্তি-মানুষের মুক্ত পরিবেশের মধ্যে পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা রইল তেমন অর্থনৈতিক সঙ্গতি যাতে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ সমান ভাবে ভোগ করবার অধিকার পায় তারও ব্যবস্থা রইল। তাই দেখি এই সংবিধানে ব্যক্তি-মানুষের মৌলিক অধিকার* এবং গোষ্ঠী-মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য নির্দেশক নীতি।** উভয়ই সমান মর্যাদা পেল। সকল ব্যক্তি-মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃতির ব্যবস্থায় নারীজাতি পুরুষের সহিত সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সংবিধানের মুখবন্ধে যে তিনটি মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যেই নারীকে তার অধিকারে স্থাপিত করবার স্বীকৃতি মিলবে। সেই তিনটি নীতি হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়সঙ্গত

* Fundamental Rights.

** Directive principles.

অধিকারের স্বীকৃতি ; চিন্তায়, বিশ্বাসে এবং ধর্ম আচরণে স্বাধীনতার স্বীকৃতি ; এবং সুযোগ-সুবিধা ও পদমর্যাদার সমান অধিকার। প্রথম ও তৃতীয় স্বীকৃতিটি নারীর ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

এরপর প্রয়োজন রইল কেবল লোকসভায় প্রাসঙ্গিক আইন পাশ করে এই অধিকারগুলি আদায় করার ব্যবস্থার। স্বাধীন ভারত সরকার এ বিষয়ও যথেষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছিলেন তাই দেখা যায় এই সময় নারীকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে স্থাপিত করতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ হয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটি বিষয় এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন আছে। এই পথে প্রথম পদক্ষেপ হল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের হিন্দু বিবাহ আইন।* এই আইন শুধু হিন্দু নয়, খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতের অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রযোজ্য। সুতরাং বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তাতে পুরুষের একাধিক বিবাহের অধিকারের উচ্ছেদ সাধিত হয়েছে। একক বিবাহ রীতিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং নারী ও পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালে উভয়কেই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে লোকসভায় গৃহীত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন।** এতে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। পরলোকগত পুত্রের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মায়ের তথা বিধবা পত্নীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

অবশ্য নারী নিপীড়ন তো একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে এমন কথা বলা যায় না। তবে নারীকে যে তার সকল অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, সে কথা অনস্বীকার্য। নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ নির্বাসন করতে এখন প্রয়োজন বলিষ্ঠ জনমত গঠন এবং নারী জাতির মধ্যে আরও ব্যাপক হারে শিক্ষার প্রসার। বলা যায় বর্তমানে তার উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হয়েছে।

এই পরিবর্তিত অবস্থায় পুরুষজাতির নারীজাতির প্রতি

---

* Hindu Marriage Act. 1955.

** Hindu Succession Act. 1956,

অধিকার লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণ করা অসঙ্গত হবে না। তিনি সুগভীর বেদনায় অভিভূত হয়ে বলেছিলেন, "পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্য বশত স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

বর্তমানে স্বাধীনত্তোর নূতন ভারতে এই চিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর উচ্চতম শিক্ষায় অধিকার এখন স্বীকৃত এবং তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকারে স্ত্রী সুসম্মানে প্রতিষ্ঠিত। ফলে সমাজের সকল স্তরে সে তার যোগ্যতা গুণে উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত। বর্তমানে ভারতের প্রশাসনিক কাজে নারী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। হাইকোর্টের বিচারকের আসন সে অলঙ্কৃত করছে, মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। আজ ভারতের সর্বোচ্চ শিক্ষা অধিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের অধ্যক্ষ একজন মহিলা এবং সেদিন পর্যন্ত একজন মহিলা ভারতের প্রধান মন্ত্রীর পদে দীর্ঘকাল তাঁর দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত পালন করে বিশ্বময় খ্যাতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে গিয়েছেন। তাঁর বিচক্ষণতা, সাহসিকতা এবং সর্বোপরি ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম এবং চূড়ান্ত আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ভাবতে ইচ্ছা করে বিদ্যাসাগর এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন যদি দেখতে পেতেন, তিনি কি গভীর তৃপ্তি পেতেন!

— ঃ সমাপ্ত ঃ —